শিক্ষক সহায়িকা

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

নবম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

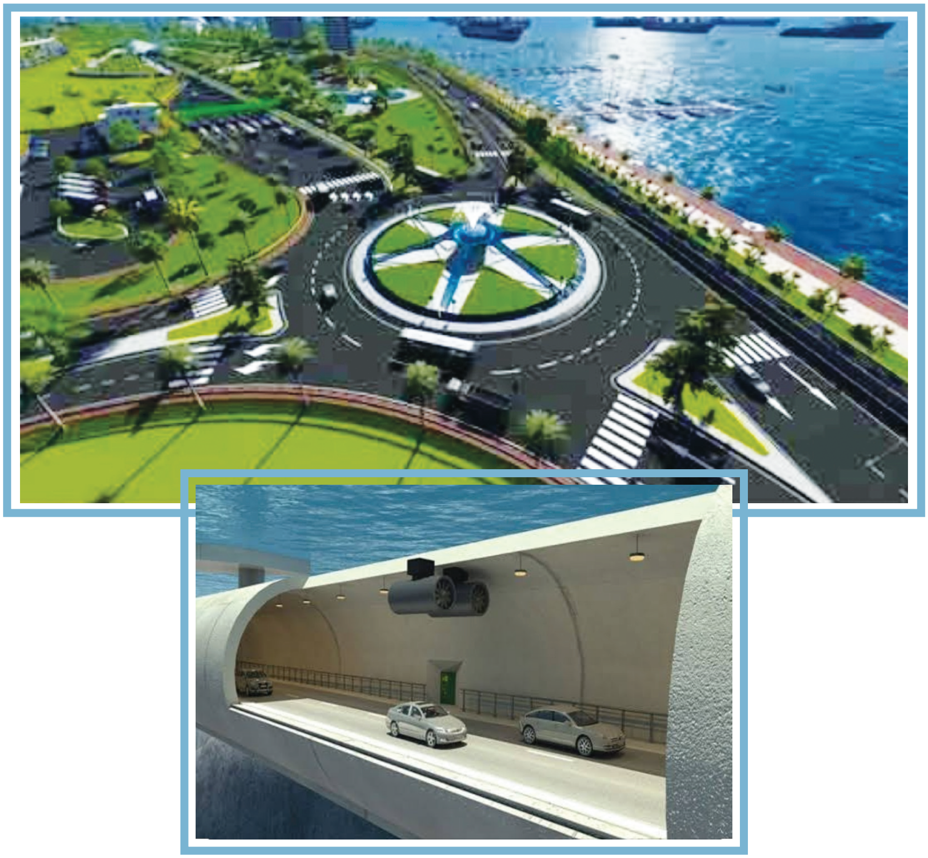

কর্ণফুলী টানেল, চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী টানেল কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে ৪ লেন বিশিষ্ট সড়ক টানেল। টানেলটি কর্ণফুলী নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে সুড়ঙ্গ পথে যুক্ত করবে। এই টানেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত হবে। টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার। এটিই বাংলাদেশের প্রথম সুড়ঙ্গ পথ। যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ, আধুনিকায়ন, শিল্প কারখানার বিকাশ সাধন এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের ফলে কর্ণফুলী টানেল বেকারত্ব দূরীকরণসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

নবম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. অসীম সরকার
অধ্যাপক ড. বিপুল কুমার বিশ্বাস
সুবর্ণা সরকার
জয়দীপ দে
বহ্নি বেপারী
সুমন চক্রবর্ত্তী
ড. প্রবীর চন্দ্র রায়
নিলয় সেন গুপ্ত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ চিত্রণ
সজীব কুমার দে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

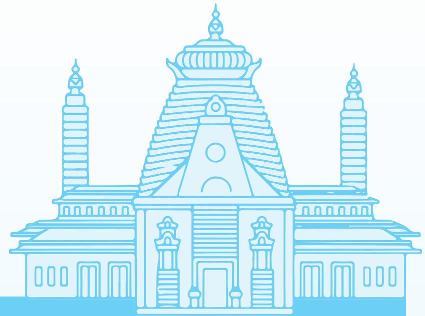

ভূমিকা

প্রিয় সহকর্মী,

নবম শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষার এই নতুন বইয়ে আপনাকে স্বাগত জানাই!

এই শিক্ষক সহায়িকাটি আপনাকে নবম শ্রেণির অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন (Experiential Learning) এর সেশনসমূহ পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। এই বইটি আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং সামর্থ্যকে বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। আপনার পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে এটি নতুন কিছু যোগ করবে। এই বইয়ের নির্দেশনার আলোকে কাজ করার মাধ্যমে আমরা সারা দেশের হিন্দুধর্ম শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থীদের এক এবং অভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারব। তাতে শিক্ষার্থীরা এই নূতন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতির কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সম্পূর্ণভাবে এবং সমভাবে অর্জন করতে পারবে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য করে তোলা প্রয়োজন। কী কী যোগ্যতা অর্জন করলে শিক্ষার্থীরা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযুক্ত হয়ে উঠবে সেগুলোকে বিবেচনার কেন্দ্রে রেখে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় মাধ্যমিক স্তরে নবম শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের জন্য তিনটি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য সহযোগিতা প্রদান, প্রয়োজনীয় শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই শিক্ষক সহায়িকাটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান শিক্ষাক্রমের আওতায় হিন্দুধর্ম শিক্ষা শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং সার্বিকভাবে একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট হবেন এই সহায়িকায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সূচিপত্র

অধ্যায়		পৃষ্ঠা
বিষয় পরিচিতি		১-৮
প্রথম অধ্যায়		
শিখন অভিজ্ঞতা ১:	হিন্দুধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ	৯-১৬
শিখন অভিজ্ঞতা ২:	রামায়ণের কথা	১৭-২২
শিখন অভিজ্ঞতা ৩:	যোগাসন	২৩-২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়		
শিখন অভিজ্ঞতা ৪:	পূজা-পার্বণ এবং ধর্মাচার	২৯-৪৪
শিখন অভিজ্ঞতা ৫:	হিন্দুধর্মীয় স্থানসমূহ	৪৫-৫৫
তৃতীয় অধ্যায়		
শিখন অভিজ্ঞতা ৬:	নৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ জীবনচরিত	৫৬-৭৯
শিখন অভিজ্ঞতা ৭:	সহমর্মিতা	৮০-৮৭

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিষয় পরিচিতি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, বিশ্বাস ও জ্ঞানের উৎসসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন ও ধারণ করতে পারা। সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্বপালন এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং ধর্মীয় জ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিধিবিধান ও অনুশাসন উপলব্ধি করে তা নিজ জীবনে অনুশীলন করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ধর্ম এক দিকে যেমন জীবনের অর্থ, মূল্য ও উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করে তেমনি নিজেকে ও অন্যকে বুঝতেও সহায়তা করে । নিজেকে সৎ, নীতিবান, দায়িত্বশীল, দয়ালু ও মানবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে সহনশীল, অসাম্প্রদায়িক, শুদ্ধ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মশিক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নিশ্চিত করতে ধর্মের নিগূঢ় মর্মবাণী উপলব্ধি করা জরুরি যা সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি এবং ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে অপব্যাখ্যা করে কেউ যেন মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে কিংবা কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ-হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি করতে না পারে তার জন্যও সঠিকভাবে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করা জরুরি। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম রূপরেখায় ধর্মশিক্ষা বিষয়টিকে তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত ক্ষেত্রের মাধ্যমে ধারণায়ন করা হয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় বিধিবিধান এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষেত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় এবং এ সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অর্জনকে প্রাধান্য দেয়া হবে-যা সার্বিকভাবে হিন্দুধর্মীয় শিক্ষার যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে।

ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান ও বিশ্বাস, জ্ঞান আহরণে আগ্রহ ও জ্ঞানের উৎস, জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি, জ্ঞানের ব্যবহার ও প্রয়োগ
ধর্মীয় বিধিবিধান	ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার জেনে ও উপলব্ধি করে চর্চা করা, ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য অনুধাবন
ধর্মীয় মূল্যবোধ	প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয় আচরণ গ্রহণ ও চর্চা এবং নিন্দনীয় আচরণ বর্জন

ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধিবিধানের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও চর্চায় অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে স্থিতিশীল, সৌহার্দ্যপূর্ণ সুখী সমাজ তথা বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব যা শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রাধান্য পেয়েছে।

যোগ্যতার ধারণা

জ্ঞান, দক্ষতা, ইতিবাচক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে। চারটি উপাদানের এই সমন্বিত রূপ যোগ্যতার ধারণাকে পূর্বের শিখনফলের ধারণা থেকে পৃথক করেছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে।

হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা :

হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হওয়া, বয়সোপযোগী বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নিজ জীবনে প্রয়োগ ও চর্চা করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।

বিস্তারিত শিক্ষাক্রম অনুসারে হিন্দুধর্ম শিক্ষার ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য উল্লিখিত শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটিকে নিচের তিনটি একক যোগ্যতায় রূপান্তর করা হয়েছে-

৬.১ হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা;

৬.২ হিন্দুধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা;

৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। এরপর তারা ধারাবাহিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের শিখন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে; যেন তারা নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে পারে । অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখন সম্পন্ন হলে তা স্থায়ী হয় এবং ক্রমাগত উপলব্ধি বা প্রতিফলনের মাধ্যমে আচরণের ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটে। এবারের শিক্ষাক্রমে তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সন্নিবেশিত চক্রটিতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ধাপগুলো দেখানো হয়েছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো, শিক্ষার্থী তার শিখন প্রক্রিয়ায় যদি এই ধাপগুলোর মধ্যে দিয়ে যায়, তাহলে শিখনটা স্থায়ীত্ব পাবে এবং কার্যকর শিখন নিশ্চিত হবে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা বা কর্মের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিখন শুরু হয় একটি কাজ বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এরপর

শিক্ষকের সামনে তার প্রতিফলন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যায় শিক্ষার্থীর বিদ্যমান অবস্থান। এরপর শুরু হয় পরবর্তী ধাপের শিখন কার্যক্রম। শিক্ষার্থীরা নিজেরা করে, দেখে শিখে, চিন্তা করে শিখে এবং প্রয়োগ করে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সচেতন, সক্রিয় ও স্বাধীন শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলে। নিচে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটি দেখানো হলো-

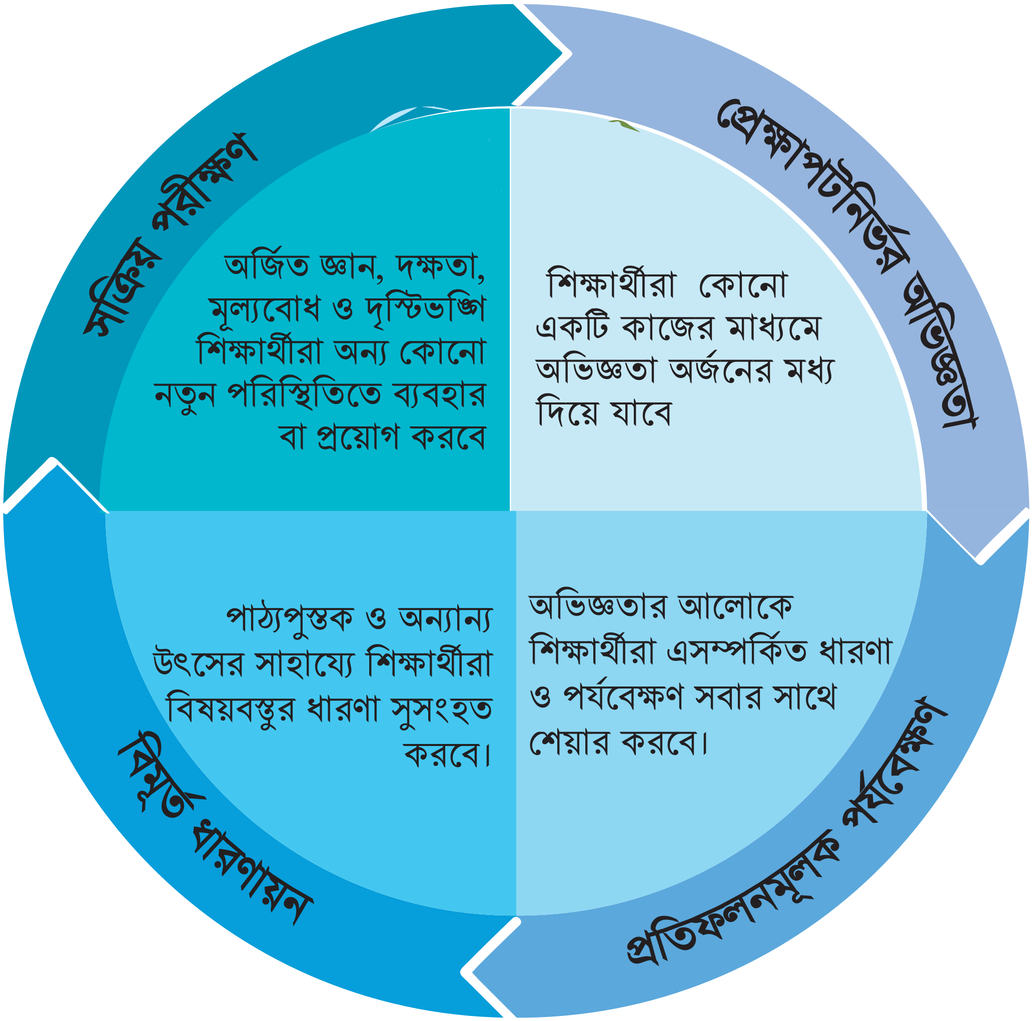

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের চারটি মূল ধাপ হলো:

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা (Concrete Experience): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় বা কার্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো একটি কাজ বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। এটি শ্রেণিতে বা শ্রেণিকক্ষের বাহিরে এমনকি শিক্ষার্থীরে দৈনন্দিন জীবনের কোনো ঘটনাও অভিজ্ঞতা হিসাবে আসতে পারে। এখানে তারা একক বা দলীয়ভাবে কাজটি করতে পারে।

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ (Reflective Observation): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা কাজ বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিজেদের ধারণা, পর্যবেক্ষণ, ও মতামত উপস্থাপন করে। অন্যের সঙ্গে নিজের ধারণা, মতামত ও অভিজ্ঞতা যাচাই করে। এই ধাপে শিক্ষার্থীরা গভীরভাবে চিন্তা করে। এ ধাপে শিক্ষক সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর বিদ্যমান অবস্থান যাচাই করার সুযোগ পান।

বিমূর্ত ধারণায়ন (Abstract Conceptualization): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যমান ধারণার সাথে পাঠ্যপুস্তকসহ আরো বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত এ সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর বিষয়য়ক ধারণার সাথে তুলনা করে নিজের ধারণাকে সুসংহত করার সুযোগ পায় এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা অর্জন করে।

সক্রিয় পরীক্ষণ (Active Experimentation): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা পূর্বের ধাপসমূহের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে নতুন বা পরিবর্তিত কোনো পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে অনুশীলন করে থাকে। মূলত অর্জিত শিক্ষা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারাই হলো শিখন যোগ্যতা অর্জন করা।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ ঘটানো এবং তাদের ২১শ শতাব্দীর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করানো।

শিক্ষক সহায়িকা বই এর ব্যবহার: সাধারণ নির্দেশাবলি

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আওতায় হিন্দুধর্ম শিক্ষার প্রতিটি যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে সকল শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষক হিন্দুধর্ম শিক্ষার প্রতিটি যোগ্যতার ৪টি প্রধান উপাদান (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) স্পষ্টরূপে চিহ্নিত ও অনুধাবন করবেন।

- সকল শিখন কার্যক্রম যোগ্যতার উপাদানগুলোর সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘচানোর মাধ্যমে পরিচালনা করবেন। হিন্দুধর্ম বিষয়ের প্রতিটি যোগ্যতার জন্য প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার নমুনা অনুসরণ করবেন।

- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়াগুলোর চর্চার সুযোগ রয়েছে সেগুলো হলো- আনন্দময় শিখন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে কাজভিত্তিক বা হাতে-কলমে শিখন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন, প্রজেক্টভিত্তিক, সমস্যাভিত্তিক এবং চ্যালেঞ্জভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, একক, জোড়া এবং দলীয় কাজসহ স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ, বিষয়নির্ভর না হয়ে প্রক্রিয়া এবং প্রেক্ষাপটনির্ভর শিখন, অনলাইন শিখনের ব্যবহার ইত্যাদি। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে ফলপ্রসূ করতে হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক, একীভূত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন শিক্ষার্থীদের মাঝে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।
- শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে শিখন কার্যক্রম আবর্তিত হবে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

- হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক ও গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াসমূহের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কারণ এ ধরনের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের শেখার সর্বাধিক সুযোগ প্রদান করে এবং সম্পূর্ণরূপে দক্ষতা বিকাশ করার সুযোগ দেয়। এই শিক্ষক রিসোর্স বইয়ের বিভিন্ন ধাপে যে সকল গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার নমুনা (সতীর্থ মূল্যায়ন, অভিভাবক মূল্যায়ন, শিক্ষকের আত্মমূল্যায়ন প্রভৃতি) সংযুক্ত করা হয়েছে, আমরা আশা করছি এ নমুনাগুলো হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিক্ষকদের মূল্যায়ন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করবে।

সেশন

হিন্দুধর্ম শিক্ষার যে তিনটি যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে তা বছরে ৫৬ টি সেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

জেন্ডার

খেয়াল রাখবেন ছেলে-মেয়ে বা তৃতীয় লিঙ্গ নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থী যেন সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। ছবি আঁকার সময় ছেলেরা মেয়েদের বা মেয়েরা ছেলেদের বা কোনো শিক্ষার্থী অন্য কোনো শিক্ষার্থীকে উপহাস বা হাস্যরস না করে। শ্রেণিতে যেন একটা পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক থাকে সে বিষয়ে আগে থেকেই গ্রাউন্ডরুলস তৈরি করে দিন। দল বা জোড়া নির্বাচনের সময় ছেলে বা মেয়ের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সবাই শ্রেণির সব কাজ করবে সে বিষয়ে খেয়াল রাখুন। ছেলেদের বা মেয়েদের বলে আলাদাভাবে কোনো কাজ চিহ্নিত করবেন না।

ইনক্লুশন

সব শিক্ষার্থী যেন অংশগ্রহণ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পছন্দ (Choice) ও সামর্থ্যকে (Capability) গুরুত্ব দিন। যেমন কোনো শিক্ষার্থী যদি ছবি না এঁকে অন্যভাবে হাতে-কলমে প্রকাশ করতে চায় সেটিকে উৎসাহ দিন। কোনো শিক্ষার্থীর যদি বাক্‌জনিত সমস্যা থাকে তাকে আলোচনার সময় অন্যভাবে মত প্রকাশ করতে দিন। কোনো শিক্ষার্থীর যদি শারীরিক কারণে দেয়ালে ছবি টাঙাতে অসুবিধা হয়, তাকে তার জায়গায় বসে ছবি দেখিয়ে মত প্রকাশ করতে দিন, অথবা তার অনুমতি নিয়ে আপনি নিজে বা শিক্ষার্থীদের কেউ দেয়ালে ছবিটি লাগিয়ে দিন। কোনো শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মান আরও কীভাবে বাড়ানো যায় তা সবসময় বিবেচনায় রাখুন, যেমন কেউ ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন হলে তাকে সামনে বসার ব্যবস্থা করে দিন। বছরের মাঝামাঝি বা ব্যতিক্রমী কোনো সময়ে নতুন কোনো শিক্ষার্থী এলে তাকে সবার সাথে পরিচিত করিয়ে সহজ হতে সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

যেহেতু এবার কোনো পরীক্ষা থাকছে না, শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে আচরণ, অংশগ্রহণ, উপস্থাপন, অর্পিত কাজ, ইত্যাদির ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন করা হবে, যেখানে শিক্ষকের পাশাপাশি সতীর্থ এবং বাবা-মা/অভিভাবকের মূল্যায়নের সুযোগ আছে। এসংক্রান্ত যাচাই তালিকা এবং রুব্রিক্সগুলো এ সহায়িকার শেষে সংযুক্ত আছে। বছরের প্রথম থেকেই শিক্ষকগণ যাতে শিখনকালীন এবং নির্দিস্ট সময়ে সামস্টিক মূল্যায়নের প্রমানক এবং তথ্যসমূহ সহজেই সংরক্ষণ করতে পারে সে জন্য শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য 'নৈপুণ্য' নামক একটি অ্যাপ আছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে শুধু মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ নয় এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক ট্রান্সক্রিপ্টও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা যাবে। অ্যাপটি কীভাবে ব্যবহার করা

যাবে তার গাইডলাইন ইতোমধ্যে শিক্ষকদেরকে দেয়া হয়েছে।

শিখন উপকরণ:

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। শিক্ষক চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব স্কুল থেকে উপকরণগুলো সরবরাহ করতে। যেসব উপকরণ শিক্ষার্থীকে সংগ্রহ করতে হয় সেগুলো যেন সহজলভ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। ব্যয়বহুল উপকরণের বদলে রিসাইক্লিং, রিইউজ এবং পরিবেশবান্ধব উপকরণকে গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষার্থীকে বিকল্প এবং সৃজনশীল উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন। যেমন: নতুন কাগজের বদলে পুরোনো ক্যালেন্ডার ব্যবহার, প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার ইত্যাদি। শিক্ষার্থী যেন উপকরণ কেনার বদলে যথাসম্ভব আশেপাশে পাওয়া যায় এরকম জিনিস ব্যবহার করে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উপকরণ কতটা জাঁকজমকপূর্ণ সেটি বিবেচনা না করে সে কতখানি যোগ্যতা অর্জন করল, কেবল সেটি বিবেচনা করবেন।

বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সহায়িকা বই কীভাবে ব্যবহার করবেন

কোভিড-১৯ অতিমারি বাংলাদেশ এবং পুরো পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং কীভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্য সম্পাদন করা হবে তা নূতনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। পরিচিত, কোলাহলমুখর এবং প্রাণচঞ্চল সরাসরি সেশনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর একজন শিক্ষক হিসেবে অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও আপনি এই সময়ে হয়তো অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করেছেন।

লক্ষ্য করুন, সেশন Online হোক বা সরাসরি, শিখন-শিক্ষণের মূল দর্শন বা ভাবনা কিন্তু একই। তাই কিছু বিশেষ প্রস্তুতি আপনাকে সরাসরি সেশনের অনুরূপ দক্ষতা বা সাবলীলতায় Online সেশন পরিচালনার জন্য কিন্তু প্রস্তুতি করতে হতে পারে। আর কোভিড-১৯ বা এজাতীয় কোনো ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধে দেশ বা এলাকাব্যাপী লকডাউনে পুনরায় Online সেশন চালু হওয়া সম্ভবপর একটি ঘটনা। সে সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এই প্রস্তুতি অর্জন করা ভারী গুরুত্বপূর্ণ।

এই সহায়িকা বইয়ে বর্ণিত অভিজ্ঞতাগুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে কীভাবে, বিশেষভাবে অনলাইনে কীভাবে পরিচালনা করবেন তার কিছু প্রস্তাব এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং আরও কিছু সক্ষমতা যেমন কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিগম্যতা, ইন্টারনেট সংযোগ, প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা, প্রভৃতি আপনাকে এখানে প্রস্তাবিত উপায়গুলোকে বাস্তবায়নের বিভিন্ন মাত্রার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। এই প্রস্তাবগুলো আপনার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার অনুরোধ রইলো।

যে সকল শিক্ষার্থীর শুনতে, বলতে, দৃষ্টিসংক্রান্ত অথবা অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের জন্য Online সেশন সম্পাদনে বিশেষভাবে যত্ন নিন। শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে কথা বলুন। কোনো কাজ সম্পাদনে অন্য শিক্ষার্থী থেকে তাকে সময় বাড়িয়ে দিন। খুঁজে দেখুন বিশেষ কোনো শিক্ষা উপকরণ আছে কি না যা ঐ শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক হবে। যেমন দৃষ্টিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় Screen-এর সকল Text পড়ে শোনায় এমন Application ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন একটি free application হলো NVDA (https://www.nvaccess.org)। পাশাপাশি যে শিক্ষার্থী কিঞ্চিত দেখতে পায় তার জন্য Monitor-এর Scaling level বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা দিন।

Online সেশন পরিচালনায় কিছু Application Software যেমন Zoom বা Google Classroom,

এমনকি Facebook-ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই Application-গুলো বেশ সহজ বা Intuitive যা আপনি হয়তো ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহার করতে পারা এবং ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারা প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নের জন্য পূর্বাবশ্যক। তাই Application-গুলো ব্যবহারে পারদর্শী হতে চেষ্টা করুন: এ সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণ হলে তাতে অংশগ্রহণ করুন, You Tube-এ বাংলা কিংবা ইংরেজিতে সহায়ক vodeo দেখুন, বা পরিচিত কারও কাছ থেকে শিখে নিন।

প্রথম এবং প্রধান কথা হলো শিখন-শিক্ষণ একটি সামাজিক ঘটনা। তাই এটা মাথায় রাখুন Online-এ শিক্ষার্থীরা যাতে একে অপরের সাথে এবং আপনার সাথে সহযোগিতাপূর্ণ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণের সকল ধাপে অংশগ্রহণ করে। এটা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আলোচনার আয়োজন বা অবস্থা সৃষ্টি করা। এই আলোচনা যখন প্রাঞ্জল হয়, শিক্ষার্থীরা যখন আনন্দের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তখন Online-এ সেশন সম্পাদনের যে সকল ত্রুটি আছে তা অনেকাংশে লাঘব হয়।

দ্বিতীয় কথা হলো আপনার Online সেশনটি যাতে শিক্ষার্থীর জন্য আগ্রহোদ্দীপক এবং উষ্ণ হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন। এই শিক্ষক সহায়িকা বইয়ের বর্ণিত সকল সেশনগুলো এমনভাবে design করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা খুব কৌতূহলোদ্দীপকভাবে ধরা দেয়। তাই এই সেশনগুলো Online-এ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও আপনার পক্ষ থেকে এই বিষয়টি মনে রাখুন। সরাসরি সেশনের বিভিন্ন অংশগুলো Online-এ কেমন হতে পারে তার কিছু ধারণা নিচে দেওয়া হলো।

সরাসরি সেশন	অনলাইন সেশন
আপনি বক্তৃতার মাধ্যমে কিছু তথ্য সরাসরি জানান	আপনি PowerPoint Presentation দেখান, সাথে বক্তৃতা বা ধারাভাষ্য দিন
আপনি শিক্ষার্থীদের Field trip-এ নিয়ে যান	শিক্ষার্থীদের যে জায়গায় নিয়ে যেতেন তার ভিডিও/ছবি দেখান
আপনি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন	আপনি Online-এ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন
শিক্ষার্থী কোনো কিছু উপস্থাপন করে	শিক্ষার্থী PowerPoint-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করে (যেমন Zoom-এ share screen ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ আলোচনা করে (যেমন Zoom-এ breakout ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ করে	শিক্ষার্থীরা Online application -এ দলগত কাজ করে (যেমন Zoom-এ breakout room ব্যবহার করে এবং পাশাপাশি ইমেইল ও অন্যান্য application ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা বোর্ডে কিছু লিখে বা আঁকে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ লিখে বা আঁকে (যেমন Zoom-এ Whiteboard ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা বোর্ডে কিছু লিখে বা আঁকে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ লিখে বা আঁকে (যেমন Zoom-এ Whiteboard ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা কোনো লিখিত কিছু জমা দেয়	শিক্ষার্থীরা Word file বা PDF শিক্ষককে online-এ পাঠায় (যেমন ইমেইলে)

আপনার সেশনটি কীভাবে শুরু করবেন এবং শিক্ষার্থীর কাছে তা আকর্ষণীয় হবে কি না তা সেশন শুরুর পূর্বে বিশেষভাবে ভেবে রাখুন। একটি নির্দিষ্ট সময় রাখুন শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় এবং খোশগল্প করার জন্য। সেশন চলাকালীন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নাম ধরে সম্বোধন করুন এবং চেষ্টা করুন class size যেমনই হোক না কেনো সবাই যাতে সেশনে সম্পৃক্ত হয়। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন, ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া শুনুন এবং অন্য শিক্ষার্থীর সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপন করুন। দলগত কাজ দিতে পারেন (যেমন Zoom-এর breakout room ব্যবহার করে)।

Online-এ সেশন পরিচালনায় কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকুন। ইন্টারনেট সংযোগের অপ্রতুলতা বা গতি নিয়ে সমস্যা না থাকলে শিক্ষার্থীদের ক্যামেরা চালু রাখতে বলুন। ক্যামেরা চালু রাখাটা সেশনের সকল কার্যাবলীর জন্য যেমন সহায়ক, তেমনি শিক্ষার্থীরা Online সেশনে অংশগ্রহণ করছে না যোগ দিয়ে চলে গিয়েছে তা বুঝতেও সাহায্য করে। Online-এ কোনো শিক্ষার্থী যাতে অপর কোনো শিক্ষার্থীকে উত্যক্ত না করে সে দিকে বিশেষ নজর দিন। এরকম কোনো কিছু ঘটলে সাথে সাথে থামান, এবং ব্যবস্থা নিন। উত্যক্তকারী শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে বলুন এবং উত্যক্তের শিকার শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক ও অনুপ্রেরণামূলক কথা বলে উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করুন। Online bullying বা cyberbullying একটি ঘৃণ্য সমস্যা যা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করুন।

সর্বোপরি Online সেশনকে অনুকূল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারার অনুরোধ রইলো। এই ব্যবস্থায় video এবং অন্যান্য অনেক interactive উপকরণ ব্যবহার বেশ সহজ হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর ভাইরাস থেকে বাঁচিয়ে শিক্ষার্থীকে প্রচলিত শ্রেণিকক্ষের বদলে একটা ভিন্ন পরিবেশে মানে তার নিজের ঘরের পরিবেশে মজার অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করার দারুণ চমৎকার কাজটি কিন্তু আপনিই করছেন!

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ১: হিন্দুধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ

যোগ্যতা ৯.১

হিন্দুধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে নির্দেশনার আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হতে পারা।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-

- হিন্দুধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানা
- হিন্দুধর্মের মৌলিক উৎসসমূহের নির্দেশনার আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হতে পারা

বিষয়বস্তু

হিন্দুধর্মের উদ্ভব, বিবর্তন এবং বিস্তার, ধর্মের লক্ষণ ও বেদ, মূর্তি পূজা, দেবতার শ্রেণিবিভাগ, ধর্মীয় প্রতীক ও তাৎপর্য

অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে 'ফ্যামিলি ট্রি' তৈরি করবে। ফ্যামিলি ট্রির বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পূর্বপুরুষ থেকে আজকের সময় পর্যন্ত মানুষের সাজ-পোশাক, ঘরবাড়ি, ব্যবহৃত জিনিসপত্রে যেসব বদল এসেছে তা দলে/ জোড়ায় পোস্টার পেপার বা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে টাইমলাইন তৈরি করে উপস্থাপন করবে। তাদের তথ্যগুলো সংক্ষেপে পাঠ্যবইয়ের টাইমলাইনে তুলে রাখবে। উপস্থাপিত পোস্টারগুলো থেকে পাওয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের ছকে লিখে রাখবে।

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের কাজ, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দুধর্মের উদ্ভব, বিবর্তন এবং বিস্তার, ধর্মের লক্ষণ ও বেদ, মূর্তি পূজা, দেবতার শ্রেণিবিভাগ এবং ধর্মীয় প্রতীক ও তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা দলে/ জোড়ায় ইনফোগ্রাফিক্স (তথ্যবহুল ও নান্দনিক ছবি, চার্ট ও লেখা; শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেসব পোস্টার তৈরি করে তাকে ইনফোগ্রাফিক্স বলা যায়) পোস্টার উপস্থাপনের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করবে। হিন্দুধর্ম থেকে পাওয়া যে ইতিবাচক বিষয়গুলো শিক্ষার্থী নিজের জীবনে চর্চা করতে পারে তা এককভাবে পাঠ্যবইয়ের ছকে অনুচ্ছেদ আকারে লিখবে।

বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৮ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

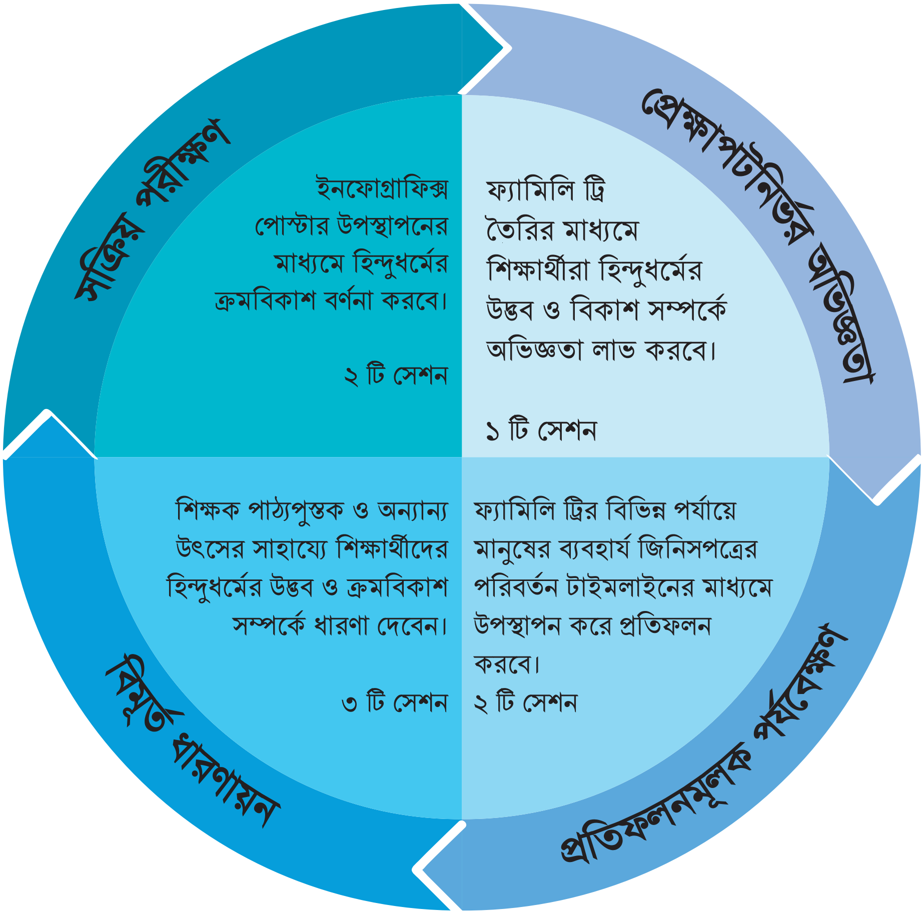

ধাপ-১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে থাকা রাজা দশরথের ফ্যামিলি ট্রি/ পরিবারবৃক্ষর ছবিটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলুন।
- তাদের প্রশ্ন করুন, ছবি দেখে তারা কী বুঝতে পারছে।
- শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হলে তাদের বুঝিয়ে বলুন যে, প্রথম ধাপে বাবা এবং মায়ের নাম, দ্বিতীয় ধাপে তাদের সন্তানদের নাম এবং সন্তানদের স্বামী/ স্ত্রীর নাম, তৃতীয় ধাপে সন্তানদের সন্তানের নাম... এভাবে ফ্যামিলি ট্রি ক্রমশ আগাতে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের বলুন, তাদের পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যতটা সম্ভব অতীত ইতিহাস জেনে নিজের 'ফ্যামিলি ট্রি' (ছক ১.১) বাড়ি থেকে তৈরি করে আনতে। বাবা অথবা মা— যে-কোনো একদিকের ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করতে বলুন। এক্ষেত্রে কোনো শিশুর অসুবিধা থাকলে তার অভিভাবকের ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করে আনতে পারে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ধাপ-২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের দল/ জোড়া গঠন করতে সাহায্য করুন। তাদের বলুন, ফ্যামিলি ট্রির বিভিন্ন পর্যায়ে, তাদের পূর্বপুরুষ থেকে আজকের সময় পর্যন্ত মানুষের সাজ-পোশাক, ঘরবাড়ি, ব্যবহৃত জিনিসপত্রে যেসব পরিবর্তন এসেছে তা দলে/ জোড়ায়, পোস্টার পেপার বা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে, টাইমলাইন (ছক ১.২) তৈরি করে উপস্থাপন করতে।
- তাদের তথ্যগুলো সংক্ষেপে পাঠ্যবইয়ের টাইমলাইনে তুলে রাখতে বলুন।
- উপস্থাপিত টাইমলাইনগুলোর মধ্যে যে বিষয়টি শিক্ষার্থীর কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে সেটি পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট ঘরে লিখে রাখেতে বলুন। (ছক ১.৩)

ধাপ-৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ৩ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকে আজকের মানুষের যেমন ক্রমবিকাশ হয়েছে, হিন্দুধর্মেরও তেমন করে ক্রমবিকাশ ঘটেছে।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত তথ্যাবলি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।

সহায়ক তথ্য

হিন্দুধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মেরই কোনো না কোনো প্রবর্তক আছেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের আসলে কোনো প্রবর্তক নেই। এ ধর্ম কেউ প্রবর্তন করেননি। এ ধর্মবিশ্বাসটি এত প্রাচীন যে তখন অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসই এ অঞ্চলে ছিল না। অনেকেই আবার একে ‘সনাতন’ ধর্ম বলে। কারণ, এ ধর্ম হাজার বছর ধরে এ অঞ্চলের বাসিন্দারা বংশ পরম্পরায় পালন করে আসছে। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টের জন্মের পাঁচ থেকে সাত হাজার বছর আগে সনাতনধর্ম বা হিন্দুধর্মের সূচনা। অর্থাৎ এটি সাত থেকে নয় হাজার বছরের পুরোনো ধর্মমত। এর সমসাময়িক প্রায় সকল ধর্মমত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেগুলো টিকে আছে সেসব ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা খুবই কম। অথচ পৃথিবীতে এখনো প্রায় ১২০ কোটি মানুষ হিন্দুধর্মাবলম্বী।

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের মানচিত্রটি দেখতে বলুন। এই অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থান বুঝিয়ে বলুন।
- সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য এশিয়ার মানচিত্র ব্যবহার করে স্থানসমূহ দেখিয়ে দিন।

সিন্ধু, বিতস্তা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, বিপাশা ও সরস্বতী— এই সাত নদীবিধৌত অঞ্চলকে প্রাচীনকালে সপ্তসিন্ধু বলা হতো। বর্তমানের কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তানের কিছু এলাকা এর মধ্যে পড়ে। এখানেই বেদকে কেন্দ্র করে সনাতন ধর্মমত বিকশিত হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারস্যের (বর্তমান ইরান) রাজা সাইরাস এ অঞ্চলে আক্রমণ চালান। পারসিকরা সপ্তসিন্ধু উচ্চারণ করতে পারত না। তারা বলত 'হপ্তহিন্দু'। সেই থেকে ভারতীয় অঞ্চলের মানুষদের বহির্বিশ্বের মানুষ 'হিন্দু' বলে অভিহিত করত। আর তাদের ধর্মবিশ্বাসকে বলা হতো 'হিন্দুধর্ম'। এখন এটাই সর্বাধিক পরিচিত নাম।

হিন্দুধর্ম কেবল একটি ধর্মই নয়, এ অঞ্চলের সুমহান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বিভিন্ন ধর্মাচারের মধ্য দিয়ে এই ধর্মটি স্থানীয় সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। খাদ্যাভ্যাসে এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে।

এই সপ্তসিন্ধুর অববাহিকা থেকে বিকশিত হওয়া হিন্দু ধর্মমত একসময়ে সুমাত্রা, জাভা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এখনো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাচীন হিন্দু-মন্দির 'আঙ্কোরওয়াট' কম্বোডিয়ায় টিকে আছে। এছাড়া মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডে হিন্দুসভ্যতার প্রচুর কীর্তি রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় প্রতীক বিষ্ণুর বাহন গরুড়। এখনো ইন্দোচীন, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিপুলসংখ্যক হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ আছেন।

হিন্দুধর্মের ভিত্তি

'ধৃ' ধাতু থেকে 'ধর্ম' শব্দটি এসেছে। ধৃ মানে ধারণ করা। কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয় যা ধারণ করে তাই তার ধর্ম। মানুষ যা ধারণ করে, মনুষ্যত্ব থেকে তাকে ভ্রষ্ট হতে দেয় না– তাই তার ধর্ম। মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগদর্শনে' বলেছেন, 'যে শক্তি পদার্থের গুণাবলি ধরে রাখে, সে শক্তিকে ধর্ম বলা যেতে পারে। মানুষের অন্তর্নিহিত যে শক্তি তাকে 'দেবত্বে' উত্তীর্ণ করে তাই তার ধর্ম। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস থেকে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের দর্শনগত পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্য অনুধাবন না করতে পারলে হিন্দুধর্মকে উপলব্ধি করা যায় না।

হিন্দুধর্ম গ্রহণের জন্য কোনো শপথবাক্য পাঠ করার প্রয়োজন হয় না। এ ধর্ম মুক্তচিন্তার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয় হিন্দুধর্ম। এই ধর্ম নিজের মতকে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র বলে দাবি করে না। এই ধর্মে বিভিন্ন ধরনের মতবাদের সহাবস্থান দেখা যায়। তাই সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে প্রায় বিনা বাধায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত বিকশিত হতে পেরেছে। অন্যের বৈচিত্র্যকে সম্মান করা হিন্দুধর্মের শিক্ষা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনই হিন্দুধর্মের মূল লক্ষ্য। ধর্মের এই উদারনৈতিক ধারার জন্য ধর্মটি এত বছর ধরে স্বমহিমায় টিকে আছে। যুগে যুগে এর সংস্কার হয়েছে। 'যুগধর্ম' হিসেবে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা একে সহজভাবে মেনেও নিয়েছেন।

- শিক্ষার্থীর ভালো লাগে হিন্দুধর্মের এরকম দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা পাঠ্যবইয়ের ১.৪ নং ছকে লিখে রাখতে বলুন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বেদ

প্রতিটি ধর্মের দুটি অংশ থাকে। ধর্মতত্ত্ব ও সাধনা। হিন্দুধর্মতত্ত্বের চারটি ধাপ রয়েছে। মনু বলেছেন—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ ধর্মস্য লক্ষণম্।।

(মনুসংহিতা, ২/১২)

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকের বাণী— এ চারটি হচ্ছে ধর্মের সাক্ষাৎ বা সাধারণ লক্ষণ। এই চারটিকে ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করলেই হিন্দুধর্মের স্বরূপ বোঝা যায়।

হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। এটিকে মানবসভ্যতার অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্ম বিকশিত হয়েছিল। শিষ্য গুরুর কাছ থেকে শুনে আত্মস্থ করতেন বলে বেদকে শ্রুতিও বলা হয়। বেদের জ্ঞান ও দর্শন ঋষিদের মাধ্যমে জগতে এসেছে। ঋষিরা নিজেদেরকে বেদের রচিয়তা মনে করেননি। তাই বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সমগ্র বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন— ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রতিটি বেদের আবার চারটি ভাগ রয়েছে। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতায় মন্ত্র বা স্তব আছে। সংহিতা অংশের ব্যাখ্যা আছে ব্রাহ্মণে। আরণ্যক অংশে ব্রাহ্মণ অংশের নিগূঢ় তত্ত্বগুলো নিয়ে আলোচনা রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাস্ত্রবিদ যে তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন তার সংকলন উপনিষদ। বেদের ছয়টি অঙ্গ রয়েছে —শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এগুলো বেদ পাঠের সহায়ক গ্রন্থ।

শ্রুতির পর স্মৃতির স্থান। অন্যতম বেদাঙ্গ হলো কল্প বা কল্পসূত্র। এই কল্পসূত্রের মধ্যে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নিয়মকানুন রয়েছে। পরবর্তীকালে সেগুলোকে অনুসরণ করে নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থগুলোকে একসঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্র বলা হয়। যেমন: মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, পরাশরসংহিতা ইত্যাদি।

এছাড়া বাল্মীকি ও ব্যাসদেব রচিত যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারত নামের মহাকাব্য দুটিকে হিন্দুধর্মে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। এ দুটি গ্রন্থে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও রীতিনীতির আলোচনা এবং প্রয়োগ বা ব্যবহার পাওয়া যায়। তাই গ্রন্থ দুটিকে মহাকাব্যের পাশাপাশি ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়। এছাড়া ১৮টি পুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণ রয়েছে। ।

- বেদ-এর চারটি ভাগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আনতে বলুন।
- সংগৃহীত তথ্যসমূহ ব্যবহার করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এককভাবে পাঠ্যবইয়ের ছক-১.৫ পূরণ করতে বলুন।

বিবর্তন ও দেবতার শ্রেণিবিভাগ

হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ হলো ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে দেবতাদের মোট সংখ্যা ৩৩ বলা হয়েছে।

যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যা মধ্যেকাদশ স্থ।

যে অপ্সুক্ষিতা মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং যুষধ্বস্।।

অর্থ:দ্যুলোকের অর্থাৎ সুদূর আকাশের দেবতা ১১ জন, পৃথিবীর দেবতা ১১ জন এবং অন্তরীক্ষের দেবতা ১১ জন। এরা স্বমহিমায় যজ্ঞ গ্রহণ করেন।

কিন্তু এই বিভিন্ন দেব-দেবী মূলত একই শক্তি বা ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ। সেটা প্রাচীন ঋষিরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই ঋগ্বেদে বলা হয়েছে : 'মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্যো জায়তে প্র্যাতরুদ্যন্' (১০/৮৮/৬)।

অর্থ: অগ্নি রাতে পৃথিবীর মস্তক, প্রাতে তিনি সূর্য হয়ে উদিত হন।

ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলে বলা হয়েছে: 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' অর্থাৎ একইজন বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছেন।

বৈদিক যুগে অগ্নিকে দেবতাদের দূতরূপে গ্রহণ করে যজ্ঞের আয়োজন করা হতো। এতে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে হবিদ্রব্য (ঘি, পিঠা, পায়েস প্রভৃতি) অর্পণ করা হতো–বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কর্মকান্ড যজ্ঞরূপে উপস্থাপন করতেন ঋষিগণ। এজন্যই হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ–ধন্য হলো ধন্য হলো মানবজীবন'। তখন দেবতাদের তুষ্টির পাশাপাশি ঋষিগণ আত্মজ্ঞান লাভের সাধনা করতেন। বহু দেবতার পরিবর্তে সর্বত্র এক ঈশ্বরের উপস্থিতি তাঁরা উপলব্ধি করলেন। নিরাকার সর্বময় ব্রহ্মের ধারণা সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাই ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও কর্ম অনুসারে এক এক দেবতার উপাসনা করেছেন। বেদে উল্লিখিত দেবতাদের বৈদিক দেবতা বলা হয়।

বেদে পৃথিবীর দেবতা হিসেবে অগ্নিকে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি পৃথিবীতে সবসময় থাকেন। বৈদিক দেবীদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঊষা। রাতের অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে নতুন সূর্য উদয়ের মাধ্যমে দিনের সূচনা করেন দেবী ঊষা। বেদে স্বর্গের দেবতা হিসেবে ইন্দ্রকে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বরের বর্ষণশক্তির প্রকাশ হলো ইন্দ্র।

বর্তমানে যেসব দেবদেবীর পূজা করা হয়, তাঁদের অনেকের নাম বেদে পাওয়া যায় না। তাঁদের নাম জানা যায় পুরাণে। পুরাণে বর্ণিত দেবদেবীকে পৌরাণিক দেবদেবী বলা হয়। পৌরাণিক যুগে দেবদেবীর বিগ্রহ বা প্রতিমা নির্মাণ করে পূজার প্রচলন হয়। বর্তমানে অনেক দেব-দেবীর রূপে অনেক বিবর্তন হয়েছে। আবার অনেক নতুন দেবদেবীর পূজাও প্রচলিত হয়েছে। প্রধান তিনজন পৌরাণিক দেবতা হলেন–ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বা মহেশ্বর।

মন্ত্রে যেভাবে দেবদেবীর রূপ কল্পনা করা হয়েছিল, বিগ্রহও ঠিক সেই রূপে নির্মিত হয়ে আসছে। পৌরাণিক যুগে মন্দির নির্মাণ করে তাতে দেবদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীকে পত্র-পুষ্পের অঞ্জলি ও ভোগারতি দিয়ে শঙ্খ, ঘণ্টা ও অন্যান্য বাদ্য বাজিয়ে পূজা করা হয়। বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতি দেবতার নিত্যপূজা করা হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে পূজা হয় ব্রহ্মা, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর। অবশ্য প্রতিদিন যে সকল দেবদেবীর পূজা হয়, বিশেষ তিথিতেও তাঁদের অনেকের পূজা করা হয়। যেমন- বিষ্ণু, গণেশ, শিব। আবার বেদ এবং পুরাণে না থাকলেও আরও কিছু দেবদেবীর পূজা করা হয়ে থাকে, যাদেরকে আমরা লৌকিক দেবদেবী বলে থাকি। মূলত বিশ্বাস থেকে যে সকল দেবদেবীর পূজা করা হয়, তাঁদের লৌকিক দেবদেবী। মনসা, শীতলা, বনবিবি, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি স্থানীয় লৌকিক দেবতার পূজা বিশেষ তিথিতে করা হয়।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার এলাকার অথবা তার জানা একজন লৌকিক দেবতা/ দেবী সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের তথ্যছক অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে আনতে বলুন।
- শিক্ষার্থীতে পাঠ্যবইয়ের তথ্যছক-১.৬ পূরণ করতে বলুন।
- তথ্যছকের শিরোনামে শিক্ষার্থীর নির্বাচিত লৌকিক দেবতা/ দেবীর নাম লিখতে বলুন।

ধর্মীয় প্রতীক, তাৎপর্য এবং মূর্তিপূজা

হিন্দুধর্মে প্রতীক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নিরাকার ব্রহ্মকে আমরা 'ওঁ' এই শব্দ প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করি। নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক হিসেবে শিবলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়। শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময় এবং লিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রতীক; এ কারণে শিবলিঙ্গ সর্বমঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার প্রতীক। শিব শব্দের অপর একটি অর্থ হলো যাঁর মধ্যে প্রলয়ের পর বিশ্ব নিদ্রিত থাকে। বলা হয়েছে 'লয়ং যাতি ইতি লিঙ্গম্'। অর্থাৎ সমস্ত কিছু যেখানে লয়প্রাপ্ত হয় তাই লিঙ্গ। লিঙ্গ-এর উপরে ত্রিপুণ্ড্র বা তিনটি সাদা দাগ থাকে। এ ত্রিপুণ্ড্র শিবের কপালে থাকে।

হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রাচীন প্রতীক স্বস্তিকা চিহ্ন। সংস্কৃতে স্বস্তিকা শব্দের অর্থ কল্যাণ বা মঙ্গল। মঙ্গলের প্রতীক হিসেবে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া আমাদের প্রধান তিন দেবতা– ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মিলিত প্রতীক হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীক।

নিরাকার ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তি হিসেবে আমরা দেবতাদের উপাসনা করি। যাঁদেরকে বিভিন্ন প্রতীকে উপস্থাপন করা হয়। পুরাণের বর্ণনা অনুসারে দেবতাদের যে মূর্ত রূপ দেওয়া হয় তাকে মূর্তি বা প্রতিমা বলা হয়। এই মূর্তিতে হিন্দুদর্শন ও শিল্পবোধের অপূর্ব প্রতিফলন ঘটেছে।

শুক্রাচার্য রচিত 'শুক্রান্তি' শাস্ত্রে তিন শ্রেণির মূর্তির কথা বলা হয়েছে।

সাত্ত্বিক: এ ধরনের মূর্তিতে দেবদেবী ভক্তকে কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদানের মুদ্রায় হাত বিন্যস্ত রেখে যোগাসনে বসে থাকেন।

রাজসিক: এতে দেবদেবী ভক্তকে কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদানের মুদ্রাসহ যুদ্ধাস্ত্র ও অলংকারসজ্জিত দেহে নিজ বাহনের উপরে উপবিষ্ট থাকেন।

তামসিক: এতে দেবদেবী অস্ত্রসজ্জিত ভয়ানক চেহারায় আবির্ভূত হন।

পুরাণে দেবদেবী সম্পর্কে যে বিবরণ আছে, সে অনুসারে মূর্তি গড়তে হয়। প্রত্যেক দেবদেবীর নিজস্ব মূর্তরূপ রয়েছে। সে মূর্তরূপে দেবদেবীর গড়ন-বিন্যাস, শারীরিক অবস্থান, গহনা, বাহন, আয়ুধ, পোশাক, কারুকাজ, সহচর, অনুচর প্রভৃতির বর্ণনা থাকে। আবার দেবতার ওপর দেবত্ব প্রকাশের জন্য মূর্তিতে জ্যোতির্বলয় ব্যবহার করা হয়।

প্রত্যেক দেবদেবীর কোনো না কোনো বাহন থাকে। এই বাহনগুলো দেবদেবীর শক্তিমত্তা ও দর্শনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়। যেমন সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস। কারণ, রাজহাঁস অসারকে বাদ দিয়ে কেবল সার অংশটুকু বেছে নিতে পারে। জল মেশানো দুধ থেকে রাজহাঁস শুধু দুধটুকু ছেঁকে পান করতে পারে । গণপতি গণেশের বাহন ইঁদুর। বিশালকায় দেবতা গণেশকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু দেখার সুযোগ করে দেয় ক্ষুদ্র বাহনটি। এভাবে বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন বৃষভ, দুর্গার বাহন সিংহ। এসব বাহন হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে বিশেষ সম্মানের। এভাবে দেবদেবীর পূজার মাধ্যমে হিন্দুরা প্রাণিকুলের প্রতি সম্মান জানায়। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে।

দেবদেবীদের হাতে থাকা বিভিন্ন বস্তুকে আয়ুধ বলে। এসব আয়ুধ বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনির প্রতিনিধিত্ব করে। সাধারণত দেবদেবীর আয়ুধ হিসেবে দেখা যায় পুস্তক, কমণ্ডলু, চক্র, শঙ্খ, গদা, পদ্ম, ঢাল, খড়্গ, লাঙ্গল, তীর,

ধনুক, কুঠার, ত্রিশূল ইত্যাদি।

হিন্দু দেবদেবীদের অধিক অঙ্গও কোনো না কোনো তাৎপর্য বহন করে। যেমন– নারী শক্তি যে অজেয় তার প্রতীক দুর্গা। মায়েরা যেভাবে ২ হাতে ১০ হাতের কাজ করে সংসার সামলান, তার প্রতীক স্বরূপ দেবী দুর্গার ১০ হাত। আধুনিক চিত্রকলাতেও এভাবে প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দেবদেবীর মূর্তরূপ সম্পর্কিত পাঠ্যবইয়ের ছক-১.৭ এককভাবে পূরণ করতে বলুন।

ধর্মের বাহ্যলক্ষণ

মনুসংহিতায় ধর্মের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে দশটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে :

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং

শৌচমিন্দ্রিয়মনিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো

দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য, ক্ষমা, আত্মসংযম, চুরি বা অপহরণ না করা, শুচিতা বা পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, প্রজ্ঞা, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ— এই দশটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ।

- শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় ধর্মের লক্ষণসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে দিন।
- তাদের বলুন, পাঠ্যবইয়ের ১.৮ ছকটির উপযুক্ত ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে বাড়ি থেকে এককভাবে পূরণ করে আনতে।
- শিক্ষার্থীদের সৎভাবে আত্মমূল্যায়ন করতে উৎসাহিত করুন। তাদের বলুন, সব মানুষের মধ্যেই ভালো-মন্দ দু'টো দিক আছে। যে নিজের মধ্যকার মন্দ গুণগুলোকে খুঁজে বের করে তা দূর করার চেষ্টা করে, সে-ই প্রকৃত ধার্মিক। নিজের মন্দকে লুকিয়ে রাখা বা অস্বীকার করার মধ্যে কোনো গৌরব নেই।
- শিক্ষার্থীরা যেন এই কাজটি নিয়ে একে অন্যকে তিরস্কার না করে— সে বিষয়েও তাদের সচেতন করবেন।

ধাপ ৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ
সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের দল/ জোড়া তৈরি করতে সাহায্য করুন।
- প্রতিটি দল/ জোড়াকে ইনফোগ্রাফিক্স (তথ্যবহুল ও নান্দনিক ছবি, চার্ট ও লেখা) পোস্টার উপস্থাপনের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে বলুন।
- হিন্দুধর্ম থেকে পাওয়া যে ইতিবাচক বিষয়গুলো শিক্ষার্থী নিজের জীবনে চর্চা করতে পারে তা পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট স্থানে (ছক ১.১০) এককভাবে অনুচ্ছেদ আকারে লিখতে বলুন। কাজটি বাড়িতেও করতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ২: রামায়ণের কথা

- এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-
- রামায়ণের বিষয়বস্তু থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানা
- রামায়ণের নির্দেশনার আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হতে পারা

বিষয়বস্তু: রামায়ণের কথা

অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা রামায়ণের চরিত্রগুলোর মধ্য থেকে নিজের পছন্দের চরিত্রগুলোর নাম লিখে এককভাবে তালিকা তৈরি করবে। দলীয়ভাবে একক তালিকাগুলো থেকে কয়েকটি চরিত্রের নাম বেছে নেবে এবং প্রতিটি দল একটি করে নাটিকা তৈরি করে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের কাজ, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে রামায়ণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষা-র্থীদের ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা দলে/ জোড়ায় এখনকার সময় আর রামায়ণের সময়ের নারীর মিল-অমিলের ছক তৈরি করবে। ‘সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আমরা’ শ্লোগানের আলোকে সমাজে নারীর গুরুত্ব এবং সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার্থীরা কী কী কাজ করবে তার পরিকল্পনা দলে/ জোড়ায় প্রণয়ন করে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করবে।

দলে/ জোড়ায় অনুসন্ধান করে উপস্থাপন করবে। সমাজে নারীর গুরুত্ব এবং সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার্থী কী করবে তা এককভাবে লিখে রাখবে।

বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভি-জ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৬ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

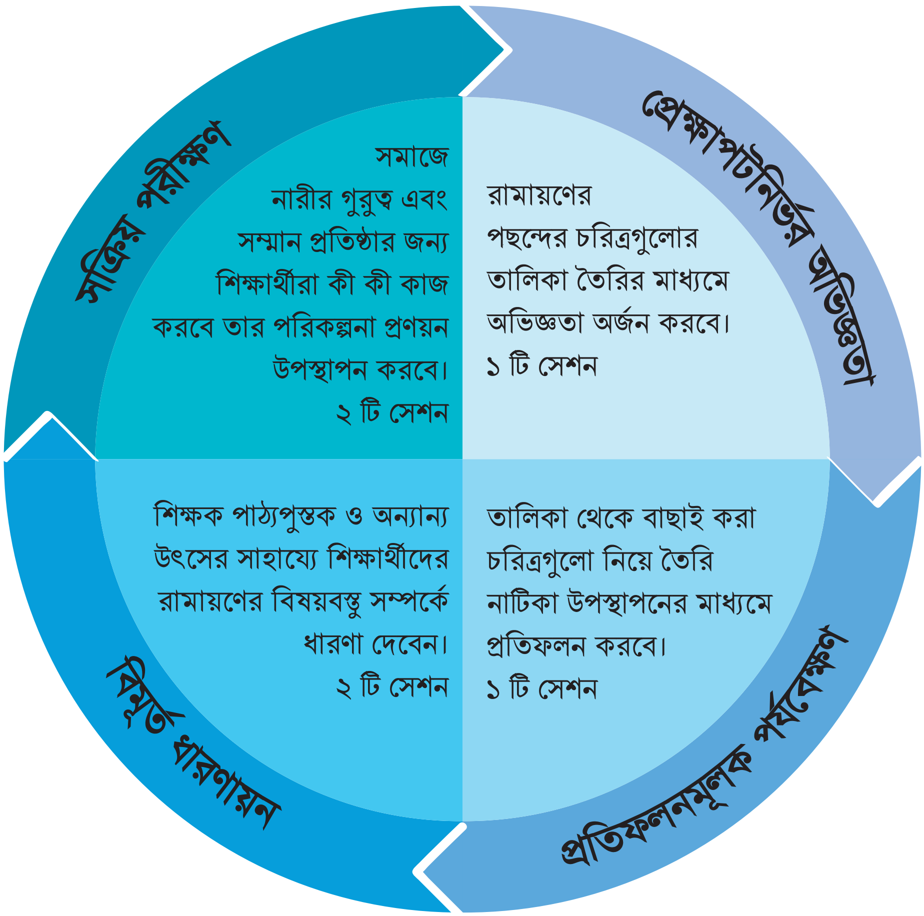

ধাপ ১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের জানা রামায়ণের কিছু ঘটনার কথা জানতে চান। তাদের প্রশ্ন করুন, রামায়ণের চরিত্রগুলোর মধ্যে কোন চরিত্রগুলো তাদের ভালো লাগে, কেন ভালো লাগে।
- শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে তাদের পছন্দের চরিত্রগুলোর নাম পাঠ্যবইয়ের ১.৯ ছকে লিখতে বলুন।

ধাপ ২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ১ টি

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

- শিক্ষার্থীদের দল/ জোড়া গঠন করতে সহায়তা করুন। প্রতিটি দল/ জোড়াকে বলুন, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রত্যেকের তালিকা থেকে একটি করে চরিত্র বেছে নিতে। তারপর সবগুলো চরিত্র নিয়ে একটি নাটিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে।
- সবগুলো দলের উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের বলুন, তারা যে নাটিকাগুলো দেখেছে তার মধ্য থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্রটির নাম এবং যে বৈশিষ্ট্যের কারণে চরিত্রটিকে তার কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে তা পাঠ্যবইয়ের ১.১০ ছকে এককভাবে লিখতে। কাজটি বাড়িতেও করতে দিতে পারেন।

ধাপ ৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, তোমরা রামায়ণের যেসব কাহিনি এবং চরিত্রকে তুলে ধরলে রামায়ণে এর বাইরেও অনেক কাহিনি এবং চরিত্র আছে।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে নামায়ণের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।

সহায়ক তথ্য

রামায়ণ

হিন্দুধর্মে রামায়ণ একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। আদিকবি বাল্মীকি এর রচয়িতা। রামচন্দ্রের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবন-কাহিনি এখানে রয়েছে। রামচন্দ্রের ধর্মনিষ্ঠা, সততা, বীরত্ব, ন্যায়-পরায়ণতা, ত্যাগ, সংযম, গুরুভক্তি, প্রজাপ্রীতি প্রভৃতি গুণাবলি এই কাহিনিতে ফুটে উঠেছে। মূল কাহিনির সাথে যুক্ত হয়েছে নানা উপ-কাহিনি।

রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত— আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড। কাণ্ডগুলো আবার মোট পাঁচশত সর্গে বিভক্ত। এই সর্গগুলোতে চব্বিশ হাজারেরও বেশি শ্লোক রয়েছে।

রামায়ণের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

আদিকাণ্ড

ত্রেতাযুগে কোশলদেশে অযোধ্যা নামে এক নগরী ছিল। স্বর্গের রাজধানী অমরাবতীর সাথে তুলনীয় এই নগরী। যুদ্ধ করে এ নগরীকে কেউ জয় করতে পারত না। তাই এর নাম অযোধ্যা। অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তাঁর তিন রানি— কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। সন্তান কামনা করে রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। এরপর কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নর জন্ম হয়। উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষায় তারা বড় হয়ে ওঠে।

- শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় (ছক ১.১১) অযোধ্য নগরীর একটি কাল্পনিক চিত্র এবং আঁকতে বলুন। ছবিটির একটি সুন্দর শিরোনাম দিতে বলুন।

এদিকে বিশ্বামিত্র মুনির সিদ্ধাশ্রমে রাক্ষসেরা বড়ই উপদ্রব শুরু করে। এ থেকে বাঁচার জন্য তিনি রাম ও লক্ষ্মণ-কে সিদ্ধাশ্রমে নিয়ে আসেন। রামের হাতে তাড়কারাক্ষসী, তাড়াকাপুত্র মারিচ ও সুবাহু নিহত হয়।

এরপর সকলে মিথিলায় আসেন। মিথিলার রাজা জনকের সীতা নামে একটি মেয়ে ছিল। জনকের ইচ্ছা, তাঁর প্রাসাদে থাকা হরধনুতে যিনি গুণ (রজ্জু) লাগাতে পারবেন, তাঁর সাথেই তিনি সীতার বিয়ে দেবেন। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে রাম ধনুক হাতে তুলে নেন। তিনি ধনুকে এত জোরে টান মারেন যে ধনুক ভেঙে দুটুকরো হয়ে যায়। এরপর রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে হয়। রাজা জনকের আরও এক মেয়ে ছিলো। তাদের মধ্যে লক্ষ্মণের সঙ্গে বিয়ে হয় ঊর্মিলার। জনকের ভাই ছিলেন কুশধ্বজ। তাঁর ছিল দুই মেয়ে মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি। শত্রুঘ্নের সঙ্গে বিয়ে হয় শ্রুতকীর্তির। ভরতের সাথে বিয়ে হয় মাণ্ডবীর। বিয়ের পর অযোধ্যায় ফেরার পথে রামের পথ আটকে দেন পরশুরাম। তিনি শুনলেন-রাম 'হরধনু' তথা শিবের নামের ধনুক ভেঙে ফেলেছেন। পরশুরাম ছিলেন শিবভক্ত। তিনি মনে করলেন রাম হরধনু ভেঙে শিবকে অপমান করেছেন। তবে রামের সাথে সুমধুর যুক্তিপূর্ণ কথায় পরশুরাম শান্ত হন।

এরপর অযোধ্যায় ফেরার পথে রামের পথ আটকে দেন পরশুরাম। পরশুরাম ছিল শিবভক্ত। অথচ রাম শিবের নামের ধনুক ভেঙে ফেলেছেন। তাতে শিবকে অপমান করা হয়। শেষে রামের সুমধুর যুক্তিপূর্ণ কথায় পরশুরাম শান্ত হয়।

অযোধ্যাকাণ্ড

অযোধ্যায় দশরথের বড় ছেলে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন শুরু হয়। আত্মীয়-স্বজন, মুনি-ঋষিরা উৎসবে যোগ দেন। সবার মনে আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু রানি কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার মনে আনন্দ নেই। কৈকেয়ীর কাছে গিয়ে সে বলে, 'রাম রাজা হলে তোমার নিজের ছেলে ভরতের কী লাভ? ভরতকে রামের দাস হয়েই থাকতে হবে। অসুস্থ রাজা দশরথকে যখন তুমি সেবাযত্ন করেছিলে তখন রাজা তোমাকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। সেই বর চেয়ে ভরতকে রাজা করার আজই সুযোগ।' মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী রাজার কাছে বর চেয়ে বলেন—

এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন।।
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে ।।

এ কথা শুনে রাজা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এদিকে পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সহধর্মিণী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণও তাঁর সঙ্গে যান। অযোধ্যাবাসী কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের বিদায় জানায়। পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু হয়। ভরত রামের সাথে বনে গিয়ে দেখা করেন। অনেক কাকুতি-মিনতি করে রামকে ফিরিয়ে আনতে চান। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে রামের পাদুকা নিয়ে তিনি ফিরে আসেন। সিংহাসনের ওপর পাদুকা রেখে রামের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অরণ্যকাণ্ড

বনবাসের সময়ে রাম-লক্ষণের হাতে বিরাধ রাক্ষস নিহত হয়। ঋষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র উপহার দেন। পঞ্চবটী বনে বসবাসের সময় রাবণের বোন শূর্পণখা রাম ও লক্ষ্মণকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়। লক্ষ্মণের হাতে শূর্পণখার নাক-কান কাটা যায়। রাক্ষসেরা রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণ করলে রামের হাতে চৌদ্দ হাজার চৌদ্দ জন রাক্ষস নিহত হয়। বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে রাবণ সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। জটায়ু-পক্ষী বাধা দিলে রাবণের খড়্গের আঘাতে তাঁর পাখা কাটা যায়। রাম-লক্ষ্মণকে সীতার অপহরণের সংবাদ জানিয়ে জটায়ুর মৃত্যু হয়।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে রাম-লক্ষ্মণ ঋষ্যমুক পর্বতের কাছে পৌঁছান। সেখানে বানররাজ সুগ্রীবের সাথে রামের অগ্নিসাক্ষী করে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। সুগ্রীব ও বালী দুই ভাই। বালী ছিলেন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। একদা অসুর বধ করতে গিয়ে বালী আর ফিরে আসছিলেন না। সবাই ভাবল বালী নিশ্চয় মারা গিয়েছেন। তাই বালীর ভাই সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসেন। বালী ফিরে এসে সুগ্রীবকে অত্যাচার করে তাড়িয়ে দেন। মৃত্যুভয়ে সুগ্রীব তখন ঋষ্যমুক পর্বতে বসবাস করছিলেন। ঋষির অভিশাপের ভয়ে বালী এই পর্বতে প্রবেশ করতেন না।

রামের পরামর্শে সুগ্রীব বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। রাম দূর থেকে বাণ নিক্ষেপ করে বালীকে হত্যা করেন। সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ঘোষণা করা হয়। এবার সুগ্রীবের নির্দেশে বানরেরা দিকে দিকে রওনা দেন। খবর চাই— কোথায় সীতা? হনুমান, জাম্বুবান প্রমুখেরা বিন্ধ্যপর্বতে পৌঁছালে সম্পাতি-পক্ষীর সাথে তাঁদের দেখা হয়। সম্পাতি জানান— লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে আকাশপথে লঙ্কায় নিয়ে গেছে। হনুমান লাফ দিয়ে সাগর পার হওয়ার উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায় ওঠেন।

সুন্দরকাণ্ড

নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে হনুমান একসময় লঙ্কায় পেঁছান। খুঁজতে খুঁজতে রাবণের অশোকবনে সীতার সাথে তাঁর দেখা হয়। এরপর হনুমান অশোকবন ধ্বংস করতে শুরু করেন । রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ এসে হনুমানকে ব্রহ্মজাল-বাণে বন্দি করে রাবণের কাছে নিয়ে আসেন। হনুমানের লেজে কাপড়-চোপড়, তেল-ঘি মেখে আগুন দেওয়া হয়। তিনি তখন লাফিয়ে লাফিয়ে প্রাসাদে প্রাসাদে আগুন লাগাতে শুরু করেন। ফিরে এসে হনুমান রামের কাছে সব খবর জানান।

যুদ্ধকাণ্ড

সাগরের উপর ভাসমান সেতু নির্মাণ করা হয়। রাম-লক্ষ্মণসহ বানরেরা দলে দলে লঙ্কায় যান। এদিকে রাবণের ভাই ধার্মিক বিভীষণ রামের চরণে শরণ নেন।

অতঃপর দুই পক্ষের মধ্যে মহাযুদ্ধ শুরু হলো। রাবণের ছোট ভাই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস ঘুমান এবং একদিন মাত্র জেগে থাকেন। অসময়ে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে যুদ্ধে নিয়ে আসা হয়। রামের ঐন্দ্রবাণে কুম্ভকর্ণর মৃত্যু হয়। লক্ষ্মণের ঐন্দ্রবাণে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতে মারা যায়।

রাবণের শক্তি-অস্ত্রের আঘাতে লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে যান। হনুমান বিশল্যকরণী ওষধি আনতে হিমালয়ে আসেন। কিন্তু বৃক্ষ চিনতে না পেরে হনুমান গোটা পর্বতশৃঙ্গই তুলে নিয়ে আসেন। ওষধির প্রয়োগে লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। রামচন্দ্র ধনুকে ব্রহ্মাস্ত্র জোড়েন । আকাশ-পাতাল কাঁপতে শুরু করে। ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে লঙ্কার রাজা রাবণের

মৃত্যু হয়। যুদ্ধশেষে রাবণের ভাই বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করা হয়। এবার যাঁকে উদ্ধারের জন্য আয়োজন, সেই সীতাকে রামের কাছে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু সীতাকে দেখে রামচন্দ্রের কোনো অতিরিক্ত আবেগ বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল না। কারণ একদিকে তিনি যেমন স্বামী, অন্য দিকে দেশের রাজাও। রামের এ অবজ্ঞা সীতা মেনে নিলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিবেন। কিন্তু মূর্তিমান অগ্নিদেব প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ড থেকে সীতাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। শেষে পুষ্পক রথে চড়ে সবাই অযোধ্যার পথে রওনা দেন। অযোধ্যায় রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়।

উত্তরাকাণ্ড

এদিকে অযোধ্যায় প্রজাদের মধ্যে একটি জনরব সৃষ্টি হয়। সীতা রাবণের লঙ্কায় বাস করেছেন। তাঁর চারিত্রিক শুদ্ধতা নষ্ট হয়েছে। রাজা রামচন্দ্র প্রজাদের খুশি করার জন্য সীতাকে বনবাসে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ গর্ভবতী সীতাকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসেন। সেখানে সীতার কুশ ও লব নামের দুই পুত্র জন্ম হয়।

এরপর বারো বছর কেটে গেছে। রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করেন। ঋষি বাল্মীকি কুশ-লবকে সাথে নিয়ে যজ্ঞে উপস্থিত হন। সীতাকে গ্রহণ করার জন্য তিনি রামকে অনুরোধ করেন। কিন্তু উপস্থিত প্রজারা তখনও নিরুত্তর। তখন রাম আবারও সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলেন। সীতা অসম্ভব অপমানিত বোধ করেন। তিনি ধরণীদেবীকে অনুরোধ করলে মাটি দুইভাগ হয়ে যায়। সেখান থেকে এক নাগবাহী সিংহাসন ওঠে আসে। সীতাদেবী সিংহাসনে বসে পাতালে প্রবেশ করেন।

অতঃপর মহাকালের নির্দেশে রামচন্দ্র একদিন লক্ষ্মণকে বর্জন করেন। সরযূ নদীর কূলে গিয়ে লক্ষ্মণ যোগবলে দেহত্যাগ করেন। কিছুদিন পর রামচন্দ্রও দেহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে সরযূ নদীর কূলে আসেন। স্বজনেরা তাঁর অনুগামী হন। রামচন্দ্র জলে নামার পর সেখানে ব্রহ্মার আগমন ঘটে। ব্রহ্মার অনুরোধে রাম বিষ্ণুর তেজে প্রবেশ করেন। অনুগামীরাও নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দিব্যলোক প্রাপ্ত হন।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে রামায়ণের সাতটি কাণ্ডের ভালো লাগা বিষয় এবং কারণ লিখে পাঠ্যবইয়ের ছক ১.১২ এককভাবে পূরণ করতে বলুন।

ধাপ ৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, রামায়ণ থেকে পাওয়া যে শিক্ষাগুলো তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগাতে পারে— এ বিষয়ে (ইথিক্স ক্লাবে আলোচনা করে) এককভাবে পাঠ্যবইয়ের ১.১৩ তথ্যছকটি পূরণ করতে।
- শিক্ষার্থীদের দল/ জোড়া তৈরি করতে সাহায্য করুন। তাদের বলুন, দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে এখনকার সময় আর রামায়ণের সময়ের নারীর মিল-অমিল খুঁজে বের করে পাঠ্যবইয়ের ১.১৪ ছক এককভাবে পূরণ করতে।
- 'সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আমরা' শ্লোগানের আলোকে সমাজে নারীর গুরুত্ব এবং সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার্থীরা কী কী কাজ করবে তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করতে বলুন।
- সমাজে নারীর গুরুত্ব এবং সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার্থী নিজে কী ভূমিকা নেবে তা পাঠ্যবইয়ের ১.১৫ ছকে এককভাবে লিখে রাখতে বলুন। কাজটি বাড়িতেও করতে দিতে পারেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ৩: যোগাসন

যোগ্যতা ৯.২

হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা এবং রীতিনীতি অনুসরণের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩: যোগাসন

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-

- যোগাসন চর্চা
- যোগাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি
- যোগাসন চর্চার মাধ্যমে শরীর ও মনের উন্নয়ন

বিষয়বস্তু

তাড়াসন, অধোমুখ বীরাসন, বিপরীত ভদ্রাসন

অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণিতে পালিত ইয়োগা ডেতে যে কার্যক্রমগুলো করেছিল তার একটি বিবরণ লিখবে। দলে/ জোড়ায় ভাগ হয়ে, দলের প্রত্যেকের লেখা মিলিয়ে ইনফোগ্রাফিক্সের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের কাজ, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে তাড়াসন, অধোমুখ বীরাসন, বিপরীত ভদ্রাসন করার পদ্ধতি এবং এই আসনগুলোর উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা দেবেন। যোগাসন করলে আমাদের কী কী উপকার হয় তা দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এককভাবে লিখবে। শিক্ষার্থীরা ইয়োগা ক্লাবের উদ্যোগে যোগাসন মেলা বা ইয়োগা ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করবে। সবাইকে যোগাসনের উপকারিতা জানানো এবং সচেতনতা তৈরির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি করে যোগাসন সম্পর্কিত শ্লোগান তৈরি করো।

বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভি-জ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৭ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

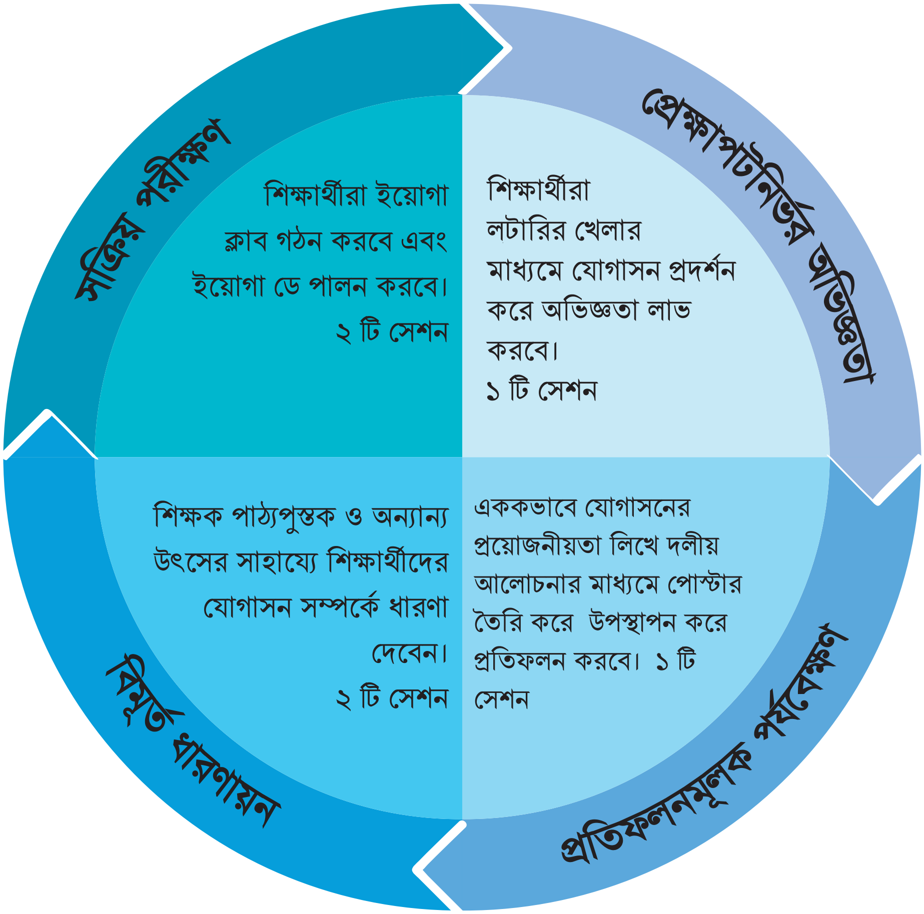

ধাপ ১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণিতে যে ‘ইয়োগা ডে’ পালন করেছিল তখন কী কী কার্যক্রম করেছিল তা মনে করতে বলুন। তাদের বলুন, পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় (ছক ১.১৬) ইয়োগা ডের কার্যক্রমগুলোর বিবরণ লিখতে।

ধাপ ২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় ভাগ হতে সাহায্য করুন। দলের প্রত্যেকের লেখার তথ্য একত্র করে ইনফোগ্রাফিক্সের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন।

ধাপ ৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ২ টি

সহায়ক তথ্য

- শিক্ষার্থীদের বলুন, আগের শ্রেণিগুলোতে আমরা বেশকিছু যোগাসন সম্পর্কে জেনেছি, প্রাত্যহিক জীবনে চর্চা করেছি। এগুলোসহ আরও কিছু যোগাসন রয়েছে।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে তাড়াসন, অধোমুখ বীরাসন এবং বিপরীত ভদ্রাসন পদ্ধতি এবং আসনগুলোর উপকারিতা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।

যোগাসন

আগের শ্রেণিগুলোতে আমরা বেশকিছু যোগাসন সম্পর্কে জেনেছি এবং প্রাত্যহিক জীবনে চর্চা করেছি। আমাদের শরীর ও মনের জন্য যোগাসন অত্যন্ত উপকারী। এবারে আমরা আরও তিনটি যোগাসন সম্পর্কে জেনে নিই।

তাড়াসন

তাড়া শব্দের অর্থ হচ্ছে পর্বত । এই আসনে দেহভঙ্গি অনেকটা পর্বতের মতো দেখায় বলে একে পর্বতাসন বা তাড়াসন বলে।

পদ্ধতি:

১. প্রথমে একটি ইয়োগা ম্যাটে অথবা আরামদায়ক জায়গায় দুই পায়ের পাতা পাশাপাশি রেখে দাঁড়াতে হবে। উভয় পায়ের উরু এবং হাঁটু কাছাকাছি থাকবে। নিতম্বের পেশী সঙ্কুচিত করে ভিতরের দিকে টানতে হবে। পেটকে না ফুলিয়ে বুক টান করে এবং মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে ।

২. উভয় পায়ের গোড়ালি ও বৃদ্ধাঙুল পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকবে। পায়ের পাতা ভূমির সাথে সংযুক্ত অবস্থায় থাকবে।

৩. যদি দাঁড়াতে বা শরীরের ভারসাম্য রাখতে অসুবিধা হয়, তাহলে দুই পায়ের পাতার মাঝখানে দুই-তিন ইঞ্চি ফাঁকা রাখা যেতে পারে ।

৪. হাত দুটো শরীরের দু’পাশে স্বাভাবিকভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। আঙুলগুলো মাটির দিকে প্রসারিত থাকবে । হাতের আঙুল একটার সাথে আরেকটা লাগিয়ে রাখতে হবে।

৫. লম্বা করে শ্বাস নিতে নিতে দুই হাত কান বরাবর মাথার উপর তুলতে হবে ।

৬. হাতের বাম আঙুলগুলোর মাঝে ডান আঙুলগুলো প্রবেশ করিয়ে জোড়বদ্ধ অবস্থায় হাতের তালু উপরমুখী করতে হবে।

৭. দেহের সকল ভার দুই পায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, দেহের ভর যেন শুধু গোড়ালি বা পায়ের পাতার উপর পড়ে।

৮. এভাবে শরীরকে স্থাপন করে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ত্রিশ সেকেন্ড স্থির রাখতে হবে ।

৯. এরপর ত্রিশ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এইভাবে আসনটি আরও দুই বার করতে হবে ।

তাড়াসনের উপকারিতা:

১. উভয় পায়ে সমান ভর দিয়ে দাঁড়ানোর অভ্যাস হয়।

২. মেরুদণ্ডের বেঁকে যাওয়া রোধ করে।

৩. হাঁটুর ব্যাথা উপশম হয়। উরুর মাংসপেশী শক্তিশালী হয়।

৪. শরীরে শক্তি জোগায়।

৫. শারীরিক উচ্চতা বাড়াতে সাহায্য করে ।

৬. বিষণ্নতা এবং মানসিক চাপ কমে।

৭. মনোবল, আত্মবিশ্বাস, একাগ্রতা ও উদ্যম বাড়াতে সহায়তা করে ।

৮. স্নায়ু শিথিল করে উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করে ।

সতর্কতা:

নিম্ন রক্তচাপ, মাইগ্রেন, অনিদ্রার সমস্যা থাকলে এ আসন না করাই ভালো।

অধোমুখ বীরাসন

মাটির দিকে মুখ রেখে বা মাটির সাথে মুখ রেখে এই আসন করা হয়। এই আসনটিকে অনেকে মুধাসনও বলে।

পদ্ধতি

১. হাঁটু মুড়ে ইয়োগা ম্যাট বা সমতল জায়গায় দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতা একত্রিত করে বসতে হবে। নিতম্ব থাকবে দুই গোড়ালির উপর।

২. দুই হাঁটুর উপর দুই হাত আলতো করে রাখতে হবে।

৩. এরপর দুই হাত সোজা করে কানের পাশ দিয়ে মাথার উপরের দিকে টেনে তুলে সোজা অবস্থানে আনতে হবে।

৪. হাত দুটোকে যতটা সম্ভব উপরের দিকে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। এই অবস্থায় কোনক্রমেই যেন হাঁটু ভূমি ছেড়ে উপরের দিকে না ওঠে।

৫. বুকের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে গভীরভাবে শ্বাস নিতে হবে ।

৬. বুক ভরে পুরো বাতাস নেওয়ার পর, শরীরকে সামনের দিকে বাঁকিয়ে মাটি স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে। এই অবস্থায় হাতকে ভাঁজ করা যাবে না এবং নিতম্ব পায়ের গোড়ালির উপরে থাকবে।

৭. হাত লম্বালম্বিভাবে মাটিতে স্পর্শ করার সময়, কপাল মাটিকে স্পর্শ করবে।

৮. হাতের তালু দুটি মাটির সাথে যুক্ত করতে হবে এবং আঙুলগুলো প্রসারিত অবস্থায় থাকবে।

৯. চিবুককে ধীরে ধীরে হাঁটুর কাছে টেনে আনতে হবে। চিবুক ও হাঁটু পরস্পর যুক্ত অবস্থানে আসবে।

১০. শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় ত্রিশ সেকেন্ড স্থির থাকতে হবে।

১১. এরপর আসন ত্যাগ করে ত্রিশ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি আরও দুইবার করতে হবে।

অধোমুখ বীরাসনের উপকারিতা

১. মনে ভয়, উৎকণ্ঠা, ক্রোধ উপশম করে প্রশান্তি আনতে এই আসন বিশেষ সহায়তা করে।

২. মেরুদণ্ড সবল হয়। পায়ের পেশী ও হাড়ের বাতের উপশম হয়। কাঁধের পেশীর ব্যথাও দূর হয়।

৩. পরিপাকতন্ত্র সবল হয়। ফলে অজীর্ণ, অম্বল ও গ্যাস্টিক দূর হয়। হজমশক্তি বৃদ্ধির কারণে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় জাতীয় পেটের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়।

৪. বহুমুত্র ও হাঁপানি রোগে উপকার পাওয়া যায়।

৫. পেটের ও নিতম্বের চর্বি কমে। উরু সবল হয়।

সতর্কতা

উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য এই আসন খুবই বিপদজনক হতে পারে ।

বিপরীত বীরভদ্রাসন

যোগশাস্ত্রে বিপরীত বীরভদ্রাসনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। একে বিপরীত যোদ্ধা ভঙ্গিও বলে। এটি বীরভদ্রাসনের একটি প্রকরণ বিশেষ।

পদ্ধতি

১. প্রথমে সমতল স্থানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত মাথার উপরে তুলতে হবে।

২. হাত দুটো কান স্পর্শ করে থাকবে এবং হাতের তালু সামনের দিকে ফেরানো থাকবে ।

৩. বাম দিকে ঘুরতে হবে। ডানপায়ের দুই থেকে আড়াই ফুট দূরে বাম পা বামে ঘুরিয়ে রাখতে হবে । ডান পা আগের ভঙ্গিতে থাকবে।

৪. বাম পায়ের হাঁটু ভেঙে শরীরকে সোজা রেখে দাঁড়াতে হবে। ডান পা পিছনে এবং সোজা থাকবে।

৫. শরীরকে পিছনের দিকে অর্ধ-চন্দ্রাসনের ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে, পিছনের ডান হাত ডান পায়ের সামনের দিকে রাখতে হবে।

৬. দশ সেকেন্ড এই অবস্থানে থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

৭. হাত ও পা বদল করে, পুনরায় আসনটি করতে হবে।

৮. এরপর আসন ত্যাগ করে বিশ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম করতে হবে। পুরো আসনটি আরও দুই বার করতে হবে।

বিপরীত বীরভদ্রাসনের উপকারিতা

১. মেরুদণ্ডের নরম হাড় মজবুত হয় এবং মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।

২. পাঁজরের হাড়ের অসমতা দূর হয়।

৩. তলপেট ও নিতম্বের মেদ কমে।

- শিক্ষার্থীদের দল/ জোড়া গঠন করতে সহায়তা করুন। তাদের কয়েকটি (/চারটি) যোগাসন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন। তারপর দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে পাঠ্যবইয়ের ১.১৭ ছকে যোগাসনগুলোর নাম এবং উপকারিতা এককভাবে লিখতে বলুন।

ধাপ ৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ৩ টি

- শিক্ষার্থীদের ইয়োগা ক্লাবের উদ্যোগে স্কুলে একটি যোগাসন মেলা বা ইয়োগা ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করতে বলুন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিন। সম্ভব হলে ২১ জুন, ইয়োগা ডে-তে আয়োজনটি করতে বলুন।
- স্কুলের শিক্ষক, কর্মচারী এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মেলায় আমন্ত্রণ জানাতে বলুন।
- স্কুল প্রাঙ্গনে কয়েকটি পোস্টার সাঁটিয়ে শিক্ষার্থীরা ইয়োগা ফেস্টিভ্যালের বিষয়ে সবাইকে জানাতে পারে।
- অন্যকে যোগাসনের উপকারিতা জানানো এবং সচেতনতা তৈরির জন্য যোগাসন সম্পর্কিত একটি করে শ্লোগান তৈরি করে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট স্থানে (ছক ১.১৮) লিখতে বলুন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ে যে একটি করে শ্লোগান লিখেছে সেগুলোর মধ্য থেকে সকলের মতামতের ভিত্তিতে ফেস্টিভ্যালের জন্য একটি শ্লোগান নির্বাচন করতে বলুন। একাধিক শ্লোগান ভালো বলে মনে হলে, ভালো শ্লোগানগুলো বাছাই করে লটারির মাধ্যমেও নির্বাচন করা যায়।
- সবাইকে যোগাসনের উপকারিতা জানানো এবং সচেতনতা তৈরির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যোগাসন সম্পর্কিত একটি করে বাণী (দৃশ্যমানভাবে) লিখে মেলায় প্রদর্শন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের বলুন, ইয়োগা ফেস্টিভ্যালে কী কী আয়োজন করা যায় সে বিষয়ে ইয়োগা ক্লাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে। তাদের বলুন, যোগাসনের পদ্ধতি ও উপকারিতা সম্পর্কে সবাই মিলে একটি নাটিকা/ পালাগান/ কবিতা ইত্যাদি রচনা করে মেলায় উপস্থাপন করতে।
- ইয়োগা ফেস্টিভ্যাল শেষে বাড়ির কাজ হিসেবে ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিফলন জার্নাল লিখতে দেবেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ৪: পূজা-পার্বণ এবং ধর্মাচার

যোগ্যতা ৯.২

হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা এবং রীতিনীতি অনুসরণের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-

- দেবদেবী, ধর্মাচার, পূজা পদ্ধতি এবং হিন্দুধর্মীয় সামাজিক বিধিবিধান সম্পর্কে জানা
- ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের রীতিনীতি জানা
- হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা এবং রীতিনীতির অনুসরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা

বিষয়বস্তু

পূজার উপকরণ, পূজার উপচার, দেবী কালী, জন্মাষ্টমী, সংক্রান্তি, দীপাবলি, ভাতৃদ্বিতীয়া, জন্ম ও বিবাহ সংক্রান্ত ক্রিয়া

অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছে এরকম একটি ধর্মীয়/ সামাজিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা লিখবে। অভিভাবক/ ধর্মীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গর সঙ্গে আলোচনা করে যে-কোনো একটি অনুষ্ঠান/ পূজা/ পার্বণের প্রয়োজনীয় উপকরণ, নিয়ম-কানুনের তালিকা করবে।

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের কাজ, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে পূজার উপকরণ, পূজার উপচার, দেবী কালী, জন্মাষ্টমী, সংক্রান্তি, দীপাবলি, ভাতৃদ্বিতীয়া, জন্ম ও বিবাহ সংক্রান্ত ক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা দলে/ জোড়ায় নিজেদের পছন্দের যে-কোনো একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান/ পূজা/ আচার/ সংস্কারের উপ-করণ সংগ্রহ করে প্রদর্শনীর আয়োজন করবে। সংগৃহীত সবগুলো উপকরণের একটি তালিকা তৈরি করবে।

বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভি-জ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৯ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

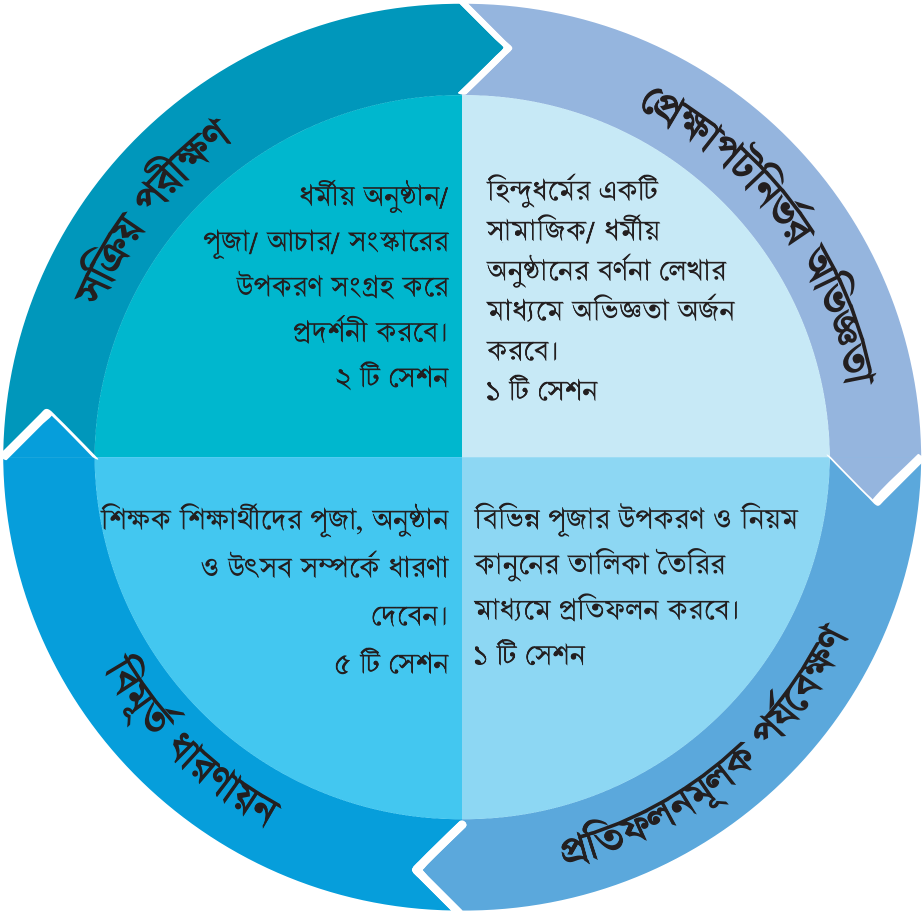

ধাপ ১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, হিন্দুধর্মের অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান আছে। যেমন বিয়ে, মুখেভাত, হাতেখড়ি ইত্যাদি। আছে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যেমন দুর্গাপূজা, কালিপূজা, সরস্বতীপূজা ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদে-রও উদাহরণ দিতে উৎসাহিত করুন।
- এবারে তাদের বলুন, তারা অংশ নিয়েছে অর্থাৎ দেখেছে/ উৎসবে আনন্দ করেছে/ কাজে অংশগ্রহণ করেছে হিন্দুধর্মের এরকম একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় (ছক ২.১) লিখতে।

ধাপ ২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ১ টি

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, অভিভাবক/ ধর্মীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গর সঙ্গে আলোচনা করে এককভাবে হিন্দুধর্মীয় যে-কোনো একটি অনুষ্ঠান/ পূজা/ পার্বণের প্রয়োজনীয় উপকরণ, নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে আনতে।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের ২.২ ছকে তালিকা তৈরি করতে বলুন।

ধাপ ৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ৫ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, এই যে বিভিন্ন ধরনের পূজা-পার্বণ, অনুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নিয়ম, নানারকম উপকরণ এগুলোকে পূজার উপচার বলা হয়।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে পূজার উপকরণ, পূজার উপচার, দেবী কালী, জন্মাষ্টমী, সংক্রান্তি, দীপাবলি, ভাতৃদ্বিতীয়া, জন্ম ও বিবাহ সংক্রান্ত ক্রিয়া শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।

সহায়ক তথ্য

পূজার উপচার

পূজা বলতে বোঝায় প্রশংসা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা। দেশ ও অঞ্চলভেদে পূজাপদ্ধতির ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। তবে পূজার মৌলিক নিয়ম ও উপচারগুলোর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। দেবদেবী অনুসারে পূজার পদ্ধতি ও মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পূজা করার সময় যেসব নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়, সেগুলোই পূজাবিধি নামে পরিচিত ।

বৈদিক যুগে পূজা ছিল যজ্ঞভিত্তিক। এরপরে পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির সাকার রূপ হিসেবে দেব-দেবীর পূজা করা হতো। ঋষিরা ধ্যানে দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করে বর্ণনা করেছেন। বহু দেবদেবীর পূজার প্রচলন থাকলেও হিন্দুধর্ম কিন্তু বহু ঈশ্বরবাদী নয়। দেবতারা ঈশ্বর নন। তাঁরা হলেন ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতার সাকার রূপের প্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর ও দেবতার রূপকে চিন্তা করে ঘট, প্রতিমা, যজ্ঞের বেদী, আগুন, জল, যন্ত্র (বিশেষ প্রতীকী চিহ্ন), প্রতিমার ছবি,মন্ডল এবং হৃদয়ে পূজা করার প্রচলন রয়েছে । বর্তমানে প্রতিমা, ছবি, ঘট প্রভৃতি আধারে পূজা করার রীতিই বেশি প্রচলিত।

পূজার উপচার বা উপকরণ

ফুল, দূর্বা, বেলপাতা, তুলসীপাতা, চন্দন, আতপচাল, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য ইত্যাদি পূজার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত পঞ্চ বা দশ উপচারে দেবতার পূজা করা হয়। তবে বিশেষ পূজায় দেবতাকে ষোড়শ উপচারে পূজা করা হয়।

পঞ্চোপচার - গন্ধ, পুষ্প (ফুল) ,ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পাঁচটি হচ্ছে পঞ্চোপচার তথা পূজার প্রধান উপচার বা উপকরণ।

দশোপচার - পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প (ফুল), ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই দশটি হচ্ছে দশোপচার।

ষোড়শোপচার - রজতাসন (রূপার আসন), স্বাগত (আবাহন), পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ ,গন্ধ, পুষ্প (ফুল), ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয় ও তাম্বুল (পান) এই ষোলোটি উপচার হচ্ছে ষোড়-শোপচার। ষোড়শ উপচারে পূজার অন্যতম উপকরণ হচ্ছে মধুপর্ক। এই মধুপর্ক দুধ, দই, ঘি, মধু, চিনি এবং সামান্য জলের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়।

এক এক দেবতা এক এক প্রকার ফুল ও পাতা বেশি ভালোবাসেন; আবার কোনো কোনো ফুল ও পাতা পছন্দ করেন না। যেমন শিব পূজায় ধুতরা ও আকন্দ ফুল, নারায়ণ পূজায় সাদা ফুল, দুর্গা পূজায় লাল রঙের ফুল মঙ্গলজনক। বিষ্ণু বা নারায়ণকে অবশ্যই তুলসী পাতা দিয়ে পূজা করতে হয়। শিব বেলপাতা পছন্দ করেন। । গণেশ, শিব ও দূর্গার পূজায় তুলসী পাতা নিষিদ্ধ। আবার নারায়ণপূজা ও সূর্যপূজায় বেলপাতা নিষিদ্ধ।

পূজার কিছু উপকরণের তাৎপর্য তুলে ধরা হলো।

১। বিগ্রহ বা প্রতিমা: প্রতিমার রূপের মাঝে নিবিড়ভাবে মগ্ন হলে ভক্ত পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে ।

২। কলস বা ঘট: পূজায় মাটি বা ধাতুর তৈরি কলস বা ঘট ব্যবহার করা হয়। কলস বা ঘট মঙ্গলের প্রতীক। এই ঘট পৃথিবী বা মানবদেহ নির্দেশ করে । ঘটের জল প্রাণ তথা কুলকুণ্ডলিনী বা পবিত্র গঙ্গার প্রতীক । কলসের মুখে আম্রপল্লব বিকাশমান প্রগতিকে নির্দেশ করে। ঘটের নারিকেল জ্ঞান তথা মস্তকের প্রতিনিধিত্ব করে । কলসের চওড়া অংশ পৃথিবীকে বোঝায়। কলসের ঘাড় অগ্নিকে এবং মুখের খোলা অংশ প্রাণরূপ বায়ুকে নির্দেশ করে । ঘটের উপর দূর্বা, চাল ও নৈবেদ্য জীবজগতের আহারের প্রতীক। ঘটের বহমান জল সঙ্গীত তথা জীবজগতের সঙ্গে সৃষ্টিশীল সুরের সম্পর্ক প্রকাশ করে।

৩। প্রদীপ: প্রদীপের আলো জ্ঞানের প্রতীক।

৪। শঙ্খ: শঙ্খ মঙ্গলসূচক পবিত্র ধ্বনির সৃষ্টি করে । জ্ঞান ও ভক্তির জগতে আহ্বান জানায় ।

৫। ফুলের মালা: ফুলের মালা সম্মান ও সজ্জিত করার মাঙ্গলিক উপকরণ ।

৬। আসন: আসন দেবতাদের বসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৭ । মুকুট: মুকুট উচ্চ সম্মানের প্রতীক।

৮। পান-সুপারি: পান শুদ্ধতার প্রতীক । সুপারির কঠিন অংশ আমাদের অহংবোধের প্রতীক, যা পূজার শেষে ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা হয়।

৯। কর্পূর: সুগন্ধি কর্পূর বিশুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতার প্রতীক।

১০। গঙ্গাজল: গঙ্গার জল পবিত্রতার প্রতীক। এই জল বিভিন্ন ধরনের রোগ-পীড়া নিরাময়ক বলে বিশ্বাস করা হয় । এই জলকে আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা ও বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে গণ্য করা হয় ।

১১। ধূপকাঠি: ধূপকাঠি আমাদের ইচ্ছাসমূহের নির্দেশক ।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

১২। থালা: থালা সমস্ত উপকরণের সমাহারের প্রতীক ।

১৩। ধূপ: ধূপ সুগন্ধ তথা ভালো কাজের প্রতীক । যা খারাপ শক্তির প্রভাব থেকে জগৎকে মুক্ত রাখে ।

১৪। চন্দন: চন্দন কাঠের গন্ধ পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে।

১৫। আবীর: আবীর রোগ নিরাময়ক ও সৌহার্দ্যের প্রতীক। তাই দোলযাত্রা বা হোলি উৎসবে এবং বিভিন্ন পূজায় এই উপকরণের ব্যবহার হয় ।

১৬। চাল: চাল বস্তুগত আহারের প্রতীক । যা প্রাণরূপ শরীরকে জীবন ধারণের জন্য টিকিয়ে রাখে।

১৭। নৈবেদ্য: ফুল, ফল, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি নৈবেদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়। যা আত্মসমর্পণের নির্দেশক।

১৮। পঞ্চারতি: পঞ্চভূতকে পরমাত্মার সাথে একাত্ম হওয়ার অনন্য মাধ্যম পঞ্চারতি ।

১৯। ঘণ্টা: ঘণ্টা মঙ্গলজনক শব্দসৃষ্টির প্রতীক ।

২০। হলুদ: হলুদ পরিশুদ্ধ চিন্তার নির্দেশক ও মনের আকর্ষক। হলুদে ভেষজ গুণ রয়েছে। হলুদ দেবী দুর্গাকেও (বাসন্তী দেবী) নির্দেশ করে।

২১। পবিত্র সুতা: পবিত্র সুতা বন্ধনের প্রতীক । তাই ঘটবন্ধনের সময় কান্ডারের চারপাশে সুতার ব্যবহার হয় ।

- শিক্ষার্থীর পছন্দমতো পূজার উপকরণের নাম, প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এগুলোর তাৎপর্য কীভাবে তার বাস্তব জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে তার একক তালিকা (ছক ২.৪) করতে বলুন।

পূজার বাদ্যযন্ত্র

দেবদেবীর পূজায় কাঁসা, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। ঘণ্টাকে বলা হয় ‘সর্ববাদ্যময়ী’। অন্য বাদ্যের অভাবে শুধু ঘণ্টা বাজিয়েও পূজা করা যায়। তবে এক এক দেবতার পূজায় এক এক বাদ্য নিষিদ্ধ। যেমন লক্ষ্মীপূজায় ঘণ্টা, শিবপূজায় করতল, দুর্গাপূজায় বাঁশি, ব্রহ্মার পূজায় ঢাক এবং সূর্যপূজায় শঙ্খ বাজানো নিষেধ।

পূজার আরতি

বাম হাতে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে মূলমন্ত্র অথবা স্তোত্রপাঠ করতে করতে দেবতার শ্রীচরণে চার বার, নাভিদেশে দুই বার, মুখমন্ডলে তিন বার ও সর্বাঙ্গে সাত বার ঘুরিয়ে পঞ্চারতি যথাক্রমে দীপ, কর্পূরদীপ, ধুপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, বস্ত্র, ফুল ও চামর দিয়ে আরতি করে প্রণাম করতে হয়। এছাড়া ময়ূর-পালকের পাখা ব্যবহা-রের প্রচলন আছে ।

এবারে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ এবং উৎসব সম্পর্কে জেনে নিই।

কালীপূজা

‘কালী’ শব্দটি ‘কাল’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। ‘কাল’ শব্দের অর্থ ‘কৃষ্ণ’ বা ‘ঘোর বর্ণ’। প্রকৃত অর্থে কাল বা সময়কে রচনা করেন যিনি তিনিই কালী । শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে বলা হয়েছে ‘কালঃ শিবঃ। তস্য পত্নীতি কালী।’ অর্থাৎ শিবই কাল। তাঁর পত্নী কালী। দেবী কালী মা দুর্গারই একটি রূপ। শাক্ত মতে তিনিই পরম ব্রহ্ম। কালী

শবরূপী শিবের উপর দণ্ডায়মান। শিব হচ্ছেন স্থির বা নীরব। আর কালী হচ্ছেন 'গতির প্রতীক'। এই গতিই জগতের প্রাণ।

দেবী কালীর উৎপত্তি

কালীর অন্য নাম শ্যামা বা আদ্যাশক্তি। বেদে যিনি জগতের মূল সত্তা অবিনাশী চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তন্ত্রে তিনিই মহামায়া লীলাময়ী আদ্যাশক্তি কালী। তিনি 'নির্গুণা স্যাপি চ' আবার 'সাকারাপি নিরাকারা'। অর্থাৎ সগুণা নির্গুণা, সাকারা নিরাকারা উভয়ই তিনি। কমলাকান্তের একটি গানে আছে, "শ্যামা কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি কখনও শূন্যরূপা"। তন্ত্র অনুসারে, কালী 'দশমহাবিদ্যা ' নামে পরিচিত দশজন প্রধান তান্ত্রিক দেবীর প্রথমা মহাবিদ্যা। শাক্ত মতে, কালী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি কারণ। দেবী কালীর অসংখ্য নামের মধ্যে দক্ষিণ, সিদ্ধ, গুন্য, ভদ্র, শ্মশান, রক্ষা ও মহাকালী।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো নগরদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে যেসব স্ত্রীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ঐগুলি দেবীমূর্তি। তাতে অনুমিত হয়, শক্তিপূজা ভারতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, আনুমানিক পাঁচ হাজার বছ-রেরও অধিককাল থেকে প্রচলিত। বৈদিক যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে জয়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দুর্গাদেবীর স্তব করতে পরামর্শ দেন। অর্জুন তখন দেবীর স্তব করলেন— 'ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোহস্তু তে। চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি।।"

দেবী কালীর আবির্ভাব সম্পর্কে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে যে, দেবাসুরের যুদ্ধে পরাজিত দেবতাদের প্রার্থনায় আদ্যাশক্তি ভগবতী পার্বতীর দেহ কোষ থেকে দেবী কৌষিকী আবির্ভূত হন। তখন ভগবতী দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন বলে তাঁর নাম হয় কালী বা কালিকা। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ডকে দেবী কালী বধ করেন। এ কারণে তাঁর আর এক নাম 'চামুণ্ডা' ।অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কাল নিয়ে মহাকাল। আর সেই মহাকালের শক্তি কালী।

কালীপূজার সময়:

দুর্গাপূজার পর কার্তিক-অগ্রাহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সারা রাত্রিব্যাপী মণ্ডপে, বাড়িতে এবং মন্দিরগুলিতে কালীপূজা হয়। আলোকসজ্জা মণ্ডপসজ্জা ও আতসবাজির মধ্য দিয়ে এই পূজার আনন্দ অনেক বেড়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের মহামারী যেমন বসন্ত, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব, ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতির সময়ে রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়। এছাড়া মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে রটন্তী এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিণী কালীপূজাও যথেষ্ট জনপ্রিয়।

কালীর বিভিন্ন রূপ

পুরাণে দেবী কালীর একাধিক রূপের বিবরণ পাওয়া যায়। মহাকাল সংহিতায় নয় প্রকার কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়— দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, কালকালী, গুহ্যকালী, কামকলাকালী, ধণকালিকা, সিদ্ধিকালী, চণ্ডিকালিকা। আবার তোড়লতন্ত্র অনুসারে কালী আট প্রকার। অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোক ও তন্ত্রসার বই দুটিতে কালীর ১৩টি রূপের উল্লেখ আছে— সৃষ্টিকালী, স্থিতিকালী, সংহারকালী, রক্তকালী, যমকালী, মৃত্যুকালী, রুদ্রকালী, পরমার্ককালী, মার্তণ্ড-কালী, কালাগ্নিরুদ্রকালী, মহাকালী, মহাভৈরবঘোর ও চণ্ডকালী। জয়দ্রথ যামল গ্রন্থে কালীর যে রূপগুলির নাম পাওয়া যায়, সেগুলি হলো— ডম্বরকালী, রক্ষাকালী, ইন্দীবরকালিকা, ধনদকালিকা, রমণীকালিকা, ঈশানকালিকা, জীবকালী,

বীর্যকালী, প্রজ্ঞাকালী ও সপ্তার্ণকালী। মুণ্ডকোপনিষদে মহাকালী স্বয়ং কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সধূম্রবর্ণা, বিশ্বরুচি, স্ফুলিঙ্গিনী, চঞ্চলজিহ্বা ইত্যাদি নামে ভূষিত হন।

কালীপূজার তাৎপর্য

দেবী কালী দিগম্বরী। এর অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে অহং ও অবিদ্যা কে ত্যাগ করেই মায়ের কাছে যেতে হবে। তিনি মুক্তকেশী। যোগশাস্ত্রে মুক্তকেশ বৈরাগ্যের প্রতীক। তিনি জ্ঞানের দ্বারা লৌকিক বা জাগতিক সকল বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। দেবীর কণ্ঠে পঞ্চাশটি পিশাচের কাটা মুণ্ডের মালা। প্রকৃতি অর্থে পঞ্চাশটি কাটা মুণ্ড বর্ণমালার প্রতীক । দেবী এখানে স্বয়ং শব্দব্রহ্মরূপিণী। দেবীর কোমরে মানুষের হাতের মালা কর্মশক্তির প্রতীক। দেবীর ত্রিনয়ন চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি স্বরূপ; যা দিয়ে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রত্যক্ষ করেন । দেবীর চার হাতে উপরে অভয় ও খড়্গ, নিচে বর মুদ্রা ও ছিন্ন নরমুণ্ড যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রতীক। দেবীর কৃষ্ণবর্ণ বা নীল রং অনন্ত অসীমকে উপস্থাপন করে। শ্বেত দন্ত পাটি দ্বারা রক্তমাখা জিভকাটা দিয়ে ত্যাগের দ্বারা ভোগকে জয় করা বোঝায়। দেবীর শ্মশ্মান-বাস কর্মফল ভোগান্তে জীবের শেষ আশ্রয় স্থলকে নির্দেশ করে ।

কালীপূজা পদ্ধতি

বাড়িতে বা মণ্ডপে প্রতিমা তৈরি করে কালীপূজা করা হয়। দেবীর চক্ষু দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই কালীপূজা শুরু হয়। ধ্যান, পূজা, আরতি, ভোগ ইত্যাদির পর প্রণাম ও পুস্পাঞ্জলির মাধ্যমে পূজা শেষ করা হয় ।

কালীপূজার ধ্যান

ওঁ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোর-দংটাবরপ্রদাম্।

হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম ।

মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ ।

চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ

সরলার্থ : দেবী কালী শবারূঢা, ভীমা ভয়ঙ্করী, তিনি ত্রিনয়নী, ভয়ানক তাঁর দাঁত, লোল জিহ্বা তাঁর। তিনি মুক্তকেশী, হাতে নরকপাল ও কর্তৃকা (কাটারি)। অপর দুহাতে বর ও অভয় মুদ্রা। দেবী হাস্যময়ী ।

এখানে কোমল ও কঠোর রূপে দেবী কালীর রূপ বর্ণিত হয়েছে।

গায়ত্রী মন্ত্র

ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শশ্মানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ ....

প্রণাম মন্ত্র

কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।

ধর্মার্থমোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে।।

সরলার্থ: হে কালী, মহাকালী, কালিকা, পাপহরণকারী , ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ দানকারিণী তোমাকে নমস্কার ।

কালীপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

দেবী কালী অন্যায় প্রতিরোধকারিণী ও কল্যাণময়ী। তিনি তাঁর ভক্তদেরকে মাতৃরূপে পালন করেন। তিনি সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত। তিনি আমাদের সদা মঙ্গল করেন। আমরা দেবী কালীর কাছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ আবার সাধারণের প্রতি কোমল হওয়ার শিক্ষা পাই ।

দেবী কালী বিশ্বের সকল অশুভ শক্তি ধ্বংস করে সকলের মধ্যে মঙ্গলবার্তা ছড়িয়ে দেন। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা কালীকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পূজা করে। এ পূজার মাধ্যমে আমাদের আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

- দেবী কালীর যে বিষয়টি সমাজের জন্য কল্যাণকর বলে শিক্ষার্থীর মনে হয় সেটি ব্যাখ্যাসহ লিখতে বলুন (ছক ২.৫)।

জন্মাষ্টমীর কথা

জন্মাষ্টমী হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের রোহিনী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। এই দিন জন্মাষ্টমী ব্রতের সাথে বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর সব জায়গায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যথাযোগ্য মযার্দায় জন্মাষ্টমী উদযাপন করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। দেবকীর দাদা কংস তাদের পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করে মথুরার সিংহাসন গ্রহণ করে। বসুদেব ও দেবকীর বিয়ের পরপরই দৈববাণীর মাধ্যমে কংস জানতে পারল যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতে তার মৃত্যু হবে। এই কথা শুনে কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করে। একে একে তাঁদের ছয় সন্তানকে হত্যা করে কংস। বসুদেব-দেবকীর সপ্তম সন্তান বলরামের জন্ম দেন রোহিণী। তাঁদের অষ্টম সন্তান হিসেবে জন্ম নেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণের জন্মরাত্রেই দৈব নির্দেশে কংসের কারাগার থেকে বসুদেব তাকে গোকুলে নিয়ে যান। তাঁর নতুন মাতাপিতা হলেন যশোদা ও নন্দ।

শৈশবেই শ্রীকৃষ্ণকে মেরে ফেলার জন্য কংস পুতনা, শকটাসুর, কালীয় নাগ, তৃণাবর্ত, বৎসাসুর ও বকাসুর, ধেনুকাসুর, অঘাসুর ইত্যাদি রাক্ষসদের পাঠায়। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রত্যেককে বধ করেন।

জন্মাষ্টমী ব্রত পালন পদ্ধতি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতের আগেরদিন সংযম পালন করে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতে হয়। জন্মাষ্টমী ব্রত পূজার দিন ভোরবেলায় স্নান করে উপবাস থাকতে হয়। তিথি অনুসারে রাতে শালগ্রাম শিলা সামনে রেখে নানাবিধ উপাচারে বাল্য গোপালরূপী কৃষ্ণের বিগ্রহ পূজা করতে হয়। গোপালরূপী বিগ্রহকে একটি ফল বা কুমড়ায় রেখে পূজার আগে কৃষ্ণের ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রতীকী আয়োজন করা হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর রেশম ও নতুন ছুরি বা ব্লেড দিয়ে নাড়ি কাটার আয়োজন করতে হয়। এরপর ষষ্ঠী দেবীর পূজা করা হয়। তারপর শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্পাদন করা হয়।

বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

ওঁ মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপাষিণম ।

শ্রীবৎস বক্ষঃ পূর্ণাঙ্গাং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ॥

সরলার্থ :

পূজামন্ত্র

"ওঁ ক্রীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।"

ধ্যান ও মন্ত্র উচ্চারণের পর বেদমন্ত্রে আগুন স্থাপন করে ঘি দিয়ে হোম করতে হয়। হোমের মন্ত্র, "ও ধর্মায় ধর্মেশ্বরায় ধর্মপতয়ে ধর্মসম্ভায় গোবিন্দায় নমো নমঃ স্বাহা। অতপর গুড়মেশানো ঘি দিয়ে চন্দ্রার্ঘ্য দিতে হয়। এসময়ে শঙ্খে জল, কুশ, চন্দন, দুর্বা, আতপ চাল নিয়ে বীরাসনে বসে চন্দ্রকে অর্ঘ্য দিতে হয়। আর মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়, "ক্ষীরোদার্ণবসম্ভুত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্য। ব্রহ্মাত্মে সহিতো মম॥"
চন্দ্রের প্রণামমন্ত্র "ও জ্যোৎস্নায়া পতয়ে তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ। নমস্তে রোহিণীকান্ত সুধাবাস নমোহ-স্তুতে ॥ নভোমন্ডল দীপায় শিরোরত্নায় ধূর্জটেঃ । কলাভিবর্দ্ধমানায় নমশ্চন্দ্রায় চারবে ।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।

প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

বসুদেবং সুতং দেবং কংসঃ চাণুর মর্দনঃ।

দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগৎ গুরোঃ।।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।

গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তুতে।।

পাপোহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।

ত্রাহি মাং পুন্ডরীকাক্ষ সর্বপাপ হরো হরিঃ।।

সরলার্থ :

তারপর দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ করে পূজা শেষ করতে হবে।

ব্রত সমর্পণ মন্ত্র- ভূতায় ভুতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূতসম্ববায় গোবিনদায় নমো নমঃ ॥"

পূজা শেষে প্রসাদ ভোজনের আগে পারণ মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়— "ওঁ সর্বায় সর্বেশ্বরায় সর্বপতয়ে সর্বসম্ভবা-য়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ ।"

জন্মাষ্টমীর শিক্ষা ও প্রভাব

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময়ে চারিদিকে অরাজকতা, নিপীড়ন, অত্যাচার চরম পর্যায়ে ছিল। সেই সময়ে মানুষের স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। সবখানে ছিল অশুভ শক্তির বিস্তার। এই অশুভ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। জন্মাষ্টমীতে আমরা পূজা ও র‍্যালির মাধ্যমে সমবেত হয়ে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও একাত্মতার বোধ প্রকাশ করি। তাই আবহকালের চিরন্তন ধারায় কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী সকলের কাছে একটি চিরন্তন উৎসব।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, তার এলাকায় কীভাবে জন্মাষ্টমী পালিত হয়, এ উপলক্ষে কী কী আয়োজন হয় তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখতে (২.৬)। যদি নিজের যদি মনে না থাকে তাহলে বাড়ির/ এলাকার বড়দের সাহায্য নিতে বলুন। কাজটি বাড়িতে করতে দিন।

সংক্রান্তি

সংক্রান্তি অর্থ সঞ্চার বা গমন করা। সূর্যের এক রাশি হতে অন্য রাশিতে সঞ্চার বা গমন করাকেও তাই সংক্রান্তি বলা হয়। প্রতিটি বাংলা মাসের শেষ দিন অর্থাৎ যেদিন মাসটি পূর্ণ হয় সে দিনকে সংক্রান্তি বলে। এভাবে বারোটি মাসে বারোটি সংক্রান্তি আসে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পৌষ সংক্রান্তি ও চৈত্র সংক্রান্তি। শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে এই দিনে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ প্রভৃতি অত্যন্ত মঙ্গলজনক।

চৈত্র সংক্রান্তির প্রধান উৎসব শিব পূজা বা নীলপূজা। এই পূজার একটি অঙ্গ চড়কপূজা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা হয়। এইজন্যই সংক্রান্তিময় বারোটি মাসের পূজা ও অনুষ্ঠানের আনন্দকে "বার মাসের তেরো পার্বন" বলে বর্ণনা করা হয়।

বর্ষবরণ

রাজা শশাঙ্কের আমল থেকে বাংলা নববর্ষের সূচনা হলেও মুগল সম্রাট আকবরের সময় থেকে এর আনন্দ আয়োজন আরো বিস্তার লাভ করে বলে মত রয়েছে। তবে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব কখন, কীভাবে প্রথম শুরু হয়েছিল তার দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামীণ বাংলাদেশে বৈশাখ মাসের শুরুতে হালখাতা, পূণ্যাহ্, আমানি, লাঠিখেলা, কবিগান, ষাঁড়ের লড়াই, বৈশাখী মেলা ইত্যাদি নামে নানা রকম পারিবারিক, সামাজিক উৎসব চালু ছিল।

বর্ষবরণের সময়ে হিন্দুরীতি অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট লোকাচার থাকলেও, পহেলা বৈশাখের উৎসবটি ঐতিহ্যগতভাবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সকলেই পালন করে আসছে। বর্তমানে এটি বাঙালির একটি সর্বজনীন জাতীয় উৎসব। অতীতের সমস্ত ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুনকে বরণ করে নিয়ে সকলের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদযাপিত হয় নববর্ষ। এসময় ব্যবসায়ীরা নববর্ষের শুরুতে তাদের পুরাতন হিসাব-নিকাশ শেষ করে নতুন হিসাবের খাতা খোলেন। এ উপলক্ষে নতুন-পুরাতন ক্রেতাদেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি-মুখ করান ব্যবসায়ীরা। উৎসবের মধ্য দিয়ে পুরোনো পাওনা আদায় করেন। এছাড়াও লোকে নতুন পোশাক পরে। ঘরে ঘরে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। নববর্ষে উপহারের মাধ্যমে কুশল বিনিময় ও কোলাকুলি করা হয়।

নববর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় বসে বৈশাখী মেলা। বিভিন্ন অঞ্চলে নৌকাবাইচ, হাডুডু খেলা, যাত্রা, পালাগান, কবিগান, বাউল-মারফতি-মুর্শিদি-ভাটিয়ালি ইত্যাদি আঞ্চলিক গানের উৎসব হয়।

বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বৈসাবি, বিজু ইত্যাদি উৎসব আনন্দমুখর পরিবেশে পালিত হয়। ফুলবিজুতে পাহাড়িরা জলে ফুল ভাসিয়ে দিয়ে জলদেবতাকে সন্তুষ্ট করে। নববর্ষ উপলক্ষে মারমা ও রাখাইনরা ঐতিহ্যবাহী পানি খেলার আয়োজন করে।

'এসো হে বৈশাখ' গানের মধ্য দিয়ে এই দিনে অনেকেই বর্ষবরণের মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। একটি বছরের জন্য অশুভকে বিদায় জানায়।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, তাদের সময়ে কীভাবে বর্ষবরণ হয় আর দাদু-ঠাকুমার বয়সী লোকেরা শৈশবে কেমন করে বর্ষবরণ করতেন তা পাঠ্যবইয়ের ছকে লিখতে। এই কাজটির প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তাদের দাদু-ঠাকুমার বয়সী মানুষদের সাক্ষাৎকার নিতে বলবেন।

দীপাবলি

দীপাবলি কথাটির অর্থ প্রদীপের সারি। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি উৎসব হয়। এই উৎসব দেওয়ালি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, দীপালি, সুখরাত্রি ইত্যাদি নামেও পরিচিত। দীপাবলির দিন লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী পূজা করা হয়। অলক্ষ্মীকে বিদায় জানিয়ে লক্ষ্মীকে মহাসমারোহে ঘরে স্থাপন করা হয়। দীপাবলি উপলক্ষে বাড়িঘর পরিস্কার করা হয়। রঙিন আলপনা এবং বিভিন্ন সামগ্রীতে ঘর সাজানো হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নতুন জামা-কাপড় পরে। হিন্দু ছাড়াও জৈন ও শিখ ধর্মাবলম্বীরা এই উৎসব পালন করে।

শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের বনবাস শেষে দেশে ফেরার সময়ে তাঁর ভক্তরা প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসব পালন করেছিলেন। আবার রাম-রাবণের যুদ্ধে রামের জয়ের সংবাদেও অযোধ্যায় দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়েছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইদিন নরকাসুরকে বধ করে ষোল হাজার বন্দিনীকে মুক্ত করেন। সেদিন পুরো দ্বারকা জুড়ে আলোকমালায় দীপান্বিতা উৎসব উদযাপন করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত— এর বর্ণনা অনুসারে বৃন্দাবনে ব্রজগোপিনীরা দীপান্বিতা অমাবস্যায় গিরিরাজ গোবর্ধনের পূজা করে বৃন্দাবনকে অসংখ্য দীপমালায় সজ্জিত করেছিল।

দীপাবলির অনুষ্ঠান অঞ্চলভেদে পাঁচদিনব্যাপী হয়। প্রথমদিন ধনতেরাস। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন এই উৎসবের শুরু। ধনতেরাসের দিন অর্থ ব্যবসায়ীদের অর্থ বর্ষের শুরু। এইদিন নতুন বাসন, সোনার গয়না ইত্যাদি কেনার রীতি দেখা যায়। দ্বিতীয় দিন নরক চতুর্দশী বা ভূত চতুর্দশীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চৌদ্দ রকমের শাক খাওয়া হয়। সাধারণত বাড়ির নারীদের সঙ্গে শিশুরাও নানারকমের শাক সংগ্রহ করতে যায়। এতে তাদের প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হয়। এইদিন পিতৃ ও মাতৃকুলের চৌদ্দ পুরুষদের স্মরণ করে চৌদ্দটা প্রদীপ জ্বালানো হয়। তৃতীয় দিন প্রদীপ, মোমবাতি, আতশবাজিতে মুখরিত হয় দীপাবলি। চতুর্থ দিন শুদ্ধ পদ্যমী বা বালি প্রতিপদা অনুষ্ঠান হয়। এইদিন নববিবাহিত বধূ স্বামীর কপালে মৃত্যুঞ্জয়ী লাল তিলক পরিয়ে আরতির মাধ্যমে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে থাকে। বৈষ্ণবরা এইদিন গোবর্ধন পূজা বা অন্নকূট করে ১০৮টি পদ রান্না করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে। পঞ্চম দিন পালিত হয় ভাইফোঁটা বা যম দ্বিতীয়া।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা উৎসব কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে, কালীপূজার দুই দিন পরে হয়। পুরাণ অনুযায়ী মৃত্যুর দেবতা যম এই তিথিতে বোন যমুনার নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে যান। সেই দিন যমুনাদেবী ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় পূজা করেন। এই পূজার ফলে যমদেব অমরত্ব লাভ করেন। যম সেদিন যমুনাকে বলেন, এই তিথিতে যে ভাই নিজের বোনের বাড়িতে গিয়ে তার পূজা স্বীকার করবে ও তার হাতে খাবার গ্রহণ করবে, তাঁর ভাগ্যে অকালমৃত্যুর ভয় থাকবে না। সেই থেকে এই তিথিটি যম দ্বিতীয়া, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা নামে পরিচিত।

আরেকটি পৌরাণিক কাহিনিতে আছে, নরকাসুরকে বধ করার পর শ্রীকৃষ্ণ বোন সুভদ্রার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সুভদ্রা ভাইকে মিষ্টি এবং ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন। ভাইয়ের কপালে তিলক লাগিয়েছিলেন। কেউ এই ঘটনাকেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসবের সূচনা বলে মনে করা হয়।

হিন্দুধর্মাবলম্বী অনেকেই এই উৎসব এখনও পালন করেন। উৎসব উপলক্ষে বোন ভাইকে নতুন জামা-কাপড় বা অন্যান্য উপহার সামগ্রী দেয় এবং ভাইও বোনকে প্রত্যুপহার দেয়। বাড়িতে বাড়িতে এই দিনে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়।

ভাইফোঁটার দিন বোনেরা ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিতে দিতে বলে—

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।

যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা॥

রাখিবন্ধন

রাখিবন্ধন উৎসবে বোনে ভাইয়ের হাতের কবজিতে রাখি বেঁধে দেয়। এর বদলে ভাই বোনকে উপহার দেয় এবং সারাজীবন তাকে রক্ষা করার শপথ নেয়। এরপর ভাই-বোন পরস্পরকে মিষ্টি খাওয়ায়।

যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের কবজিতে আঘাত লেগে রক্তপাত শুরু হলে দ্রৌপদী নিজের শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের হাতে বেঁধে দেন। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে নিজের বোন বলে সম্বোধন করতেন এবং দ্রৌপদীকে এর প্রতিদান দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। অনেকদিন পর কৌরবরা যখন দ্রৌপদীকে অপমান করে তাঁর বস্ত্রহরণ করতে চাইল তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করে সেই প্রতিদান দেন। এইভাবেই রাখীবন্ধনের প্রচলন শুরু হয়। আবার পৌরাণিক কাহিনি মতে, বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ছেড়ে দৈত্যরাজা বলির রাজ্য রক্ষা করতে এসেছিলেন। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য এক সাধারণ মেয়ের ছদ্মবেশে বলিরাজের কাছে আসেন। লক্ষ্মী বলিকে বলেন, আমার স্বামী নিরুদ্দেশ। যতদিন না তিনি ফিরে আসেন, ততদিন আমাকে আশ্রয় দিন। বলিরাজা তাঁর অনুরোধ রাখেন। শ্রাবণ পূর্ণিমা উৎসবে লক্ষ্মী বলিরাজার হাতে একটি রাখি বেঁধে দেন এবং আত্মপরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বলেন। এতে বলিরাজা মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। বলিরাজা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন। সেই থেকে শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথিটি বোনেরা রাখিবন্ধন উৎসব হিসেবে পালন করে।

বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদ হিসেবে, ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন। তিনি বাংলার সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা এবং বাংলাকে ভাগ করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এই উৎসব করেন। সেইদিন তিনি পথে পথে হেঁটে সকলের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই দিনটির উদ্দেশে একটি গান লিখেছিলেন—

“বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল-

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ-

পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা –

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন –

এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

রবীন্দ্রনাথ হয়ত উত্তর ভারত থেকে রাখিবন্ধনের প্রেরণা পেয়েছিলেন। শ্রাবণী পূর্ণিমায় সেখানে হিন্দু ও জৈনসমাজে সৌহার্দ্য বা ভ্রাতৃত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে পরস্পরের হাতে রঙিন সুতা বেঁধে দেওয়ার রীতি আছে। সুতা বাঁধার সময়ে তারা বলে: যার দ্বারা মহাবলী দৈত্যরাজ বলিকে বাঁধা হয়েছিল, তার দ্বারা আমি তোমাকে বাঁধলাম অর্থাৎ এ বন্ধন যেন কখনও ছিন্ন না হয়।

- শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় পরিকল্পনা করে সহজলভ্য উপাদান দিয়ে প্রত্যেকে একটি করে নান্দনিক রাখি তৈরি করে সহপাঠীদের সঙ্গে ‘রাখিবন্ধন’ উৎসব পালন করতে বলুন।
- রাখিবন্ধন উৎসবের আলোকে পাঠ্যবইয়ের ২.৭ ছকটি পূরণ করতে বলুন। কাজটি বাড়িতেও করতে পারে।

নবান্ন

‘নবান্ন’ শব্দের অর্থ ‘নতুন অন্ন’ বা নতুন ভাত। এটি বাংলার একটি লোক উৎসব। হেমন্তে আমন ধান কাটার পর অগ্রহায়ন কিংবা মাঘ মাসে হিন্দু গৃহস্থরা এই উৎসব উদযাপন করে। নবান্ন উৎসবে দেবতা, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, পাড়া-পড়শি, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে নতুন অন্ন নিবেদন করা হয়। এই উৎসবে চালের তৈরি খাদ্যসামগ্রী কাককে নিবেদন করা একটি বিশেষ লৌকিক প্রথা। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, কাকের মাধ্যমে ওই খাদ্য মৃতের আত্মার কাছে পৌঁছে যায়। এই নৈবেদ্যকে বলে ‘কাকবলী’।

পৌষ সংক্রান্তির দিনেও গৃহদেবতাকে নবান্ন নিবেদন করার প্রথা আছে। এই দিন নতুন ধানের চাল দিয়ে ভাত, নানা রকম পিঠা দিয়ে পূর্ব পুরুষদের শ্রাদ্ধ করা হয়। কালের বিবর্তনে এই নবান্ন উৎসবের মুখরতা অনেকটা কমে গেলেও গ্রাম-বাংলায় এখনও টিকে আছে। নবান্ন উৎসবে পিঠা-পায়েস আদান প্রদান কীর্তন, পালাগান, জারিগানে গ্রাম -বাংলা মুখরিত হয়ে ওঠে।

গৃহপ্রবেশ

নতুন বাড়ি তৈরি এবং বাড়িতে প্রথম প্রবেশ করার সময় বিভিন্ন পূজা ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের বিধান আছে।

আমাদের জীবনে চতুবর্গ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পরিপূর্ণতা দেয় একটি গৃহ। নতুন গৃহে প্রবেশের সময় বিষ্ণু, বাস্তু বা ভূমি, গৃহকর্তার অভীষ্ট দেবতার পুজা করা হয়। এসময় নান্দিমুখ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের আর্শীবাদ কামনা করা হয়। দ্বারদেবতার পূজা হয়। নতুন ঘর তৈরির আগে ভূমি পূজা বা ভিত পূজারও বিধান আছে। গৃহপ্রবেশের দিন পুরোহিত, গুরুজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। এই দিন গৃহকর্তা সকলকে নিয়ে গৃহের সর্বাঙ্গীন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন।

- শিক্ষার্থীর এলাকায় হিন্দুধর্মসংশ্লিষ্ট যেসব লোক-উৎসব পালিত হয় সেগুলো সম্পর্কে দলে বা জোড়ায় তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন।
- সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে পাঠ্যবইয়ের ২.৮ ছকটি এককভাবে পুরণ করতে বলুন।

জন্ম ও জন্ম পরবর্তী ক্রিয়া

ধর্মীয় রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে সমগ্র জীবনব্যাপী যেসব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালন করা হয় সেগুলোই হিন্দু ধর্মমতে সংস্কার। মনুসংহিতা, পরাশর সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দুধর্মের এইসব সংস্কারগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে লেখা আছে।

জন্ম ও জন্ম পরবর্তী সময়ে প্রত্যেক সনাতন ধর্মাবলম্বীর জন্য পালনীয় কিছু বিধি-বিধান আছে। এগুলোকে দশবিধ সংস্কার বলা হয়। এখনকার সময়ে দশবিধ সংস্কারের সবগুলো সমানভাবে পালিত হয় না।

দশবিধ সংস্কারগুলো হলো—

১. গর্ভাধান (অথর্ববেদ ৬/৮১/২): শুভ লগ্নে সন্তান জন্মদানরূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

২. পুংসবন (অথর্ববেদ ৩/২৩/৬): পুত্র সন্তানের কামনায় যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়।

৩. সীমন্তোন্নয়ন (ঋগ্বেদ ২/৩২/৪): গর্ভধারণের পর চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে নিরাপদ প্রসবের আকাঙ্ক্ষায় এই সংস্কার পালন করা হয়। বর্তমানে এই সংস্কারটি সাধ-ভক্ষণ বা সাধ নামে বেশি পরিচিত।

৪. জাতকর্ম (ঋগ্বেদ ৫/৭৮/৯): সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে পিতা যব, যষ্টিমধু ও ঘৃত দ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন।

৫. নামকরণ (যজুর্বেদ ৭/২৯): সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার দশম, একাদশ, দ্বাদশ বা শততম দিনে নামকরণ করতে হয়।

নামকরণের পর নিষ্ক্রমণ নামে আরেকটি অতিরিক্ত সংস্কারের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

নিষ্ক্রমণ (অথর্ববেদ ৮/২/১৪): নিস্ক্রমণ অর্থ "বাইরে যাওয়া"। এই অনুষ্ঠানে বাবা-মা শিশুকে বাইরে নিয়ে যান। এসময়ে শিশুটি প্রথমবারের মতো বাইরের পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়। জন্মের পর চতুর্থ মাসে এটি পালন করার নিয়ম। শিশুকে স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরানো হয়। তাকে বাইরে নিয়ে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চাঁদ বা সূর্য দেখানো হয়।

৬. অন্নপ্রাশন (অথর্ববেদ ৮/২/১৯): শিশুর প্রথম খাবার খাওয়া উপলক্ষে যে মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান হয় তাকে অন্নপ্রাশন বলে। একে আমরা 'মুখে ভাত' হিসেবেও জানি। পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে এই অনুষ্ঠান হয়। অন্নপ্রাশনে আত্মীয়, প্রতিবেশীরা নিমন্ত্রিত হিসেবে এসে শিশুকে আশীর্বাদ করেন, উপহার দেন।

অন্নপ্রাশনের পর বিদ্যারম্ভ নামে আরেকটি সংস্কার প্রচলিত আছে।

বিদ্যারম্ভ: ছোট শিশুদের জ্ঞান, অক্ষর এবং শেখার প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠান। শিশু চার বছর অতিক্রম করলে পঞ্জিকা দেখে বিদ্যারম্ভের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা হয়। এরপর পূজা-অর্চনা হয়। শিশুকে হাতে ধরে অক্ষর লেখানো হয়। এই সংস্কারটি 'হাতেখড়ি' নামেই বেশি পরিচিত।

৭. চূড়াকরণ (অথর্ববেদ ৬/৬৮/৩): গর্ভাবস্থায় সন্তানের মাথায় যে চুল হয় তা কেটে ফেলার তা মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান। উপনয়ন সংস্কার থাকলে এটি উপনয়নের সময় নতুবা অন্নপ্রাশনের সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

এই সংস্কারের সাথে কর্ণভেদ নামে একটি অতিরিক্ত সংস্কারের উল্লেখ আছে।

কর্ণভেদ (অথর্ববেদ ৬/১৪/২): কর্ণভেদ অর্থ "কানে ছিদ্র করা"। এই সংস্কারটি মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি পালন করতে দেখা যায়। উপনয়ন সংস্কারে চূড়াকরণের পর কর্ণভেদের বিধান আছে।

৮. উপনয়ণ (অথর্ববেদ ১১/৫/৩): উপনয়ণ সংস্কারে বিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রথমে গুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয় 'উপনয়ন' শব্দটির মানে 'কাছে নিয়ে যাওয়া'। প্রচলিত একটি অর্থে উপনয়ন বলতে বোঝায় যজ্ঞপবীত বা পৈতা ধারণ।

অষ্টম সংস্কার বা উপনয়নের পরবর্তী বেদারম্ভ নামে আরেকটি অতিরিক্ত সংস্কারের উল্লেখ আছে।

বেদারম্ভ (অথর্ববেদ ১১/৫/২৪): উপনয়নের পরেই এই সংস্কার পালন করা হয়। এই সময় বেদ এবং বিভিন্ন শাস্ত্র অনুসারে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন শুরু হয়। জ্ঞানের সকল শাখায় তাকে বিচরণ করতে হয়। এর মাধ্যমে সে জাগতিক এবং আধ্যত্মিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে।

৯. সমাবর্তন (ঋগ্বেদ ৩/৮/৪): লেখাপড়া শেষে গুরু যখন শিষ্যকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দেন তখন একটি উৎসব হয়। এটিই সমাবর্তন। আগেকার দিনে উপনয়ন শেষে গুরুগৃহে বাস করাই ছিল রীতি। সেখানে লেখাপড়া শেষ করে গুরুর অনুমতি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হতো।

বর্তমানে গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন নেই। সে কারণে এ সংস্কারটি এখন আর পালিত হয় না। তবে 'সমাবর্তন' নামটি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্র বিতরণ উৎসব এখন 'সমাবর্তন' নামে উদযাপিত হয়। এখ-নকার সময়ে যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের উপাধিপত্র (সার্টিফিকেট) প্রদান উৎসবের সঙ্গে আগেকার গুরুগৃহ ত্যাগের উৎসবের তুলনা করা যেতে পারে।

১০. বিবাহ (অথর্ববেদ ১১/৫/১৮): বিবাহ শব্দের অর্থ বিশেষরূপে ভারবহন করা। প্রাপ্তবয়সে বেদ ও পিতৃপুজা, হোম ইত্যাদির মাধ্যমে মন্ত্র উচ্চারণ করে বর ও কনের জীবনকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার সংস্কা-রকে বিবাহ বা বিয়ে বলা হয়। এর মাধ্যমে পরিবার গড়ে ওঠে। পরিবারের সকলে মিলেমিশে সুখ-দুঃখ ভাগ

করে, একে অপরকে সহযোগিতা করে জীবন যাপন করে।

বিবাহে যেমন কতকগুলো শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান পালিত হয়, তেমনি পালিত হয় কতগুলো লৌকিক ও স্থানীয় স্ত্রী-আচার।

মনুসংহিতায় আট রকমের বিবাহ পদ্ধতির বর্ণনা আছে। যথা- ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। বর্তমান সমাজে ব্রাহ্ম বিবাহই বেশি প্রচলিত ও স্বীকৃত। বাবা-মা মেয়েকে নতুন কাপড় ও অলংকারে সাজিয়ে, আমন্ত্রিত অতিথি ও আত্মীয়-স্বজনকে সাক্ষী রেখে, বরের কাছে কন্যাদান করেন। একে ব্রাহ্মবিবাহ বলে। আবার প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সমাজে গান্ধর্ব বিবাহেরও প্রচলন আছে। নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি শপথ করে মাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ করে, তাকে বলা হয় গান্ধর্ব বিবাহ। বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রটি হলো—

"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্ত হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।" (ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)

অর্থাৎ তোমার এই হৃদয় হোক আমার, আমার হৃদয় হোক তোমার।

বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা থাকে। তারা একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে জীবনের পথে নতুন যাত্রা শুরু করে।

- দশবিধ সংস্কারের মধ্যে কোনগুলো তুমি দেখেছ/ শুনেছ (পরিবারের বড়দের সঙ্গে/ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে) তার তালিকা তৈরি করে বর্ণনা করো (ছক ২.৯)।

ধাপ ৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় নিজেদের পছন্দের কোনো একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান/ পূজা/ আচার/ সংস্কারের উপকরণ সংগ্রহ করে প্রদর্শনীর আয়েজন করতে বলুন।
- পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট ছকে তাদের সংগৃহীত সবগুলো উপকরণের একটি তালিকা (ছক ২.১০) তৈরি করতে দিন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ৫: হিন্দুধর্মীয় স্থান সমূহ

যোগ্যতা ৯.২

হিন্দুধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা এবং রীতিনীতি অনুসরণের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-

- সপ্ততীর্থ সম্পর্কে জানা
- ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে হিন্দুধর্মের বিস্তার সম্পর্কে জানা
- তীর্থভ্রমণ এবং বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জানা এবং যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে সমৃদ্ধি আসে তা অনুধাবন করতে পারা

বিষয়বস্তু

সপ্ততীর্থ, বিশ্বময় হিন্দুধর্ম

অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা তীর্থস্থান বা ধর্মীয় স্থাপনা ভ্রমণ/ ভিডিও দেখা/ তীর্থযাত্রীর কাছে গল্প শোনা/ আগের শ্রেণিতে পরিচিত হওয়া ইত্যাদি অভিজ্ঞতার আলোকে যে-কোনো একটি তীর্থস্থানের উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পর্কে লিখে উপস্থাপন করবে। তারপর দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে আরও যেসব তীর্থস্থানের কথা তারা জানে সেগুলোর মধ্য থেকে পাঁচটির নাম ও অবস্থান লিখবে।

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের কাজ, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে সপ্ততীর্থ এবং বিশ্বময় হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী কীভাবে তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো পালনের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন রক্ষা করছে তা দলে/ জোড়ায় ইনফোগ্রাফিক্সের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। বিভিন্ন দেশের পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে, সেই দেশের পতাকা, মানচিত্র, প্রতীক ইত্যাদি অনুষজ্ঞা সঙ্গে নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে/ জোড়ায় ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে সেই দেশের ধর্মীয় উৎসবগুলো কীভাবে পালিত হয় তা উপস্থাপন করবে। পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট ছকে, বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় উৎসব উপস্থাপনের জন্য কী কী প্রয়োজন তার তালিকা করবে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ১০ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

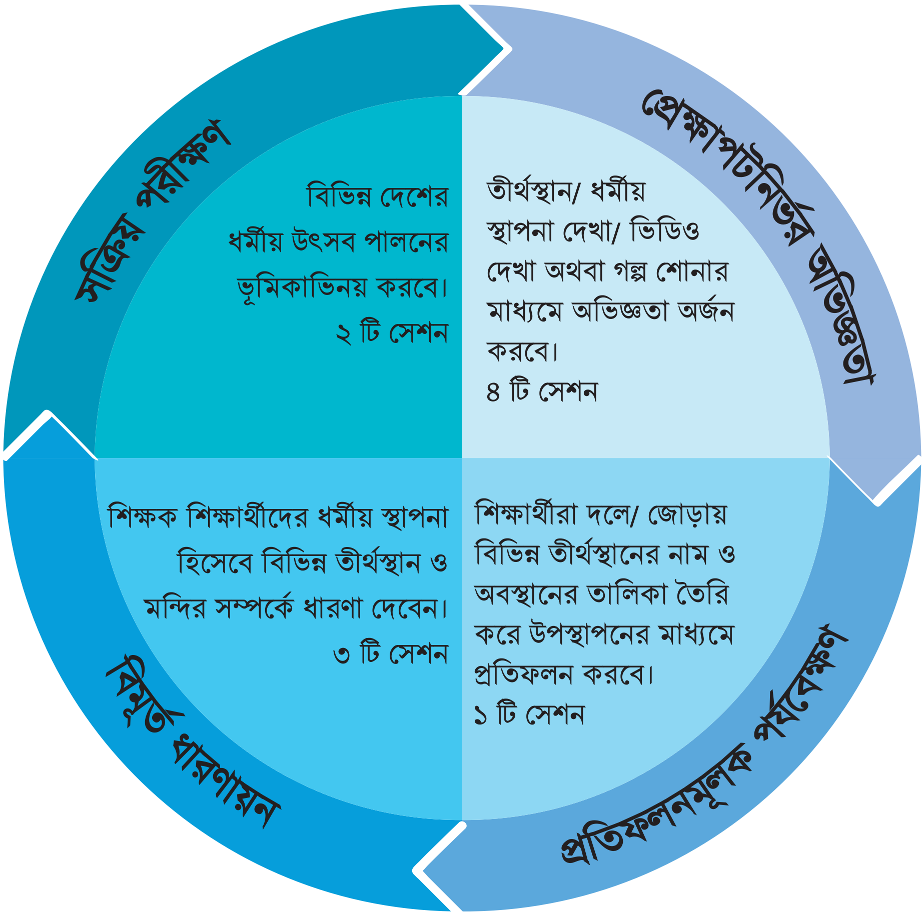

ধাপ ১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ৪ টি

- শিক্ষার্থীদের তীর্থস্থান অথবা ধর্মীয় স্থাপনা ভ্রমণ/ ভিডিও দেখা/ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে গল্প শোনা/ আগের শ্রেণিতে পরিচিত হওয়া ইত্যাদি অভিজ্ঞতার আলোকে যে-কোনো একটি তীর্থস্থান অথবা ধর্মীয় স্থাপনার উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পর্কে এককভাবে পাঠ্যবইয়ের ছকে লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।

ধাপ ২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সেশন ১ টি

- শ্রেণিকক্ষে সতীর্থদের উপস্থাপনা দেখে আরও যেসব ধর্মীয় স্থাপনা / তীর্থস্থানের কথা শিক্ষার্থীরা জানে সেগুলোর মধ্য থেকে পাঁচটির নাম ও অবস্থান দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট স্থানে (ছক ২.১১) লিখতে বলুন।

ধাপ ৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ৩ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন তীর্থস্থান এবং ধর্মীয় স্থাপনার কথা জানলাম। এবারে এগুলোর বাইরে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থাপনা বা মন্দির এবং তীর্থস্থান সম্পর্কে জানব।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে সপ্ততীর্থ এবং বহির্বিশ্বে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন।

সহায়ক তথ্য

সপ্ততীর্থ

অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী বা বারণসী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারকা— এই সাতটি তীর্থকে একসাথে সপ্ততীর্থ বলা হয়। এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।

পুরী-দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ।। (পদ্মপুরাণ, ভূমিখন্ড)

সরলার্থ: অযোধ্যা, মথুরা, মায়া বা হরিদ্বার, কাশী বা বারাণসী, কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুরম, অবন্তিকা বা উজ্জয়িনী এবং দ্বারাবতী বা দ্বারকা এই সাতটি তীর্থ মানুষকে মোক্ষ দান করে।

সপ্ততীর্থের মধ্যে অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার এবং কাশী এই চারটি তীর্থের বর্ণনা দেওয়া হলো:

অযোধ্যা

ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি শহর অযোধ্যা। বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের জন্ম ও লীলাভূমি হলো অযোধ্যা। শাস্ত্রে তাই অযোধ্যাকে সপ্ততীর্থের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অযোধ্যায় সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে মহাবীর হনুমানের মন্দির 'হনুমানগড়'। লঙ্কা-জয় শেষে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে হনুমানও অযোধ্যায় আসেন। হনুমানকে এই হনুমানগড়ে থাকতে দেয়া হয়েছিল। টিলাসদৃশ উঁচু জায়গায় মন্দিরটির অবস্থান। হনুমানের সাথে এখানে রাম-সীতার পূজা করা হয়।

কণকভবন অযোধ্যার একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির। এখানে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত রাম-সীতার মূর্তি রয়েছে। বিয়ের পর রাম ও সীতা মিথিলা থেকে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। তারপর তাঁরা কণকভবনে বসবাস করতে থাকেন। এখানে রামসীতার নিত্যপূজা করা হয়।

অযোধ্যায় রঘুবংশের কুলগুরু ঋষি বশিষ্ঠের একটি আশ্রম আছে। হিন্দি ভাষায় রামায়ণ-রচয়িতা তুলসী দাসের নামে এখানে 'তুলসী স্মারক ভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে রামলীলা ও কীর্তনগান হয়।

তীর্থের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান সরযূ নদী। এখানে অনেকগুলো শানবাঁধানো ঘাট রয়েছে। যার মধ্যে রামঘাট সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ঘাটে রামচন্দ্র দেহত্যাগ করার জন্য নদীর জলে নামেন। ঠিক তখনই ব্রহ্মা উপস্থিত হয়ে রামকে বিষ্ণুর জ্যোতিতে প্রবেশ করতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র বিষ্ণুর জ্যোতির সাথে মিশে যান। রামের অনুগামীরাও এই স্থানে নদীর জলে দেহত্যাগ করে দিব্যলোক প্রাপ্ত হন। তাই এই ঘাটকে রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থান ঘাট বলা হয়। ঘাটের জলে সিক্ত হয়ে পাপমুক্ত হওয়া যায়। এখানে পিতৃতর্পণ করলে পিতামাতা স্বর্গবাসী হন ভক্তদের এমন বিশ্বাস রয়েছে। রামঘাটের পাশেই লক্ষ্মণঘাট। নদীর যে স্থানে লক্ষ্মণ যোগবলে দেহত্যাগ করেন— সেই স্থানের নাম লক্ষ্মণঘাট।

অযোধ্যার সবচেয়ে বড় উৎসব দুটি— রামনবমী ও দীপাবলি। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ঐ তিথিতে পালন করা হয় রামনবমী। আবার, লঙ্কা-জয় শেষে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে আসেন। অযোধ্যাবাসীরা আনন্দিত হয়ে সেদিন মাটির প্রদীপ জ্বালায়। রামকে অভিনন্দন জানায়। কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। অমাবস্যার অন্ধকারে গঙ্গার ঘাটগুলো তখন আলোকময় হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থী এই উৎসবে যোগ দেন।

ভারতের বড় শহরগুলো থেকে ট্রেনে বা বাসে চড়ে সেখানে পৌঁছানো যায়। অযোধ্যা ক্যানটনমেন্ট স্টেশন থেকে মূল তীর্থের দূরত্ব দশ কিলোমিটার। অটোরিকশা বা ট্যাক্সিতে করে এই দূরত্ব অতিক্রম করা যায়।

মথুরা

উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার একটি প্রাচীন শহর মথুরা। এর পাশেই বৃন্দাবন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে মথুরায় কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য ও কৈশোর লীলা অতিবাহিত হয় বৃন্দাবনে। ভক্ত ও ভগবানের লীলামাহাত্ম্যে পূর্ণ এই দুটি স্থান। এসব মিলে মথুরা তীর্থ। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার মন্দির রয়েছে। প্রধান প্রধান মন্দির ও শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্যের কিছু অংশ এখানে বর্ণনা করা হলো।

কেশব মন্দির: মথুরা শহরে অবস্থিত এটি একটি প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের মূল বেদীর বামপাশে রয়েছে জগান্নথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার ছবি। ডানপাশে রয়েছে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বিগ্রহ। কাছাকাছি রয়েছে মহাবীর হনুমানের মূর্তি। মন্দির-চত্বরের ভিতরে একটি ছোট মন্দির রয়েছে যাকে কংসের কারাগার বলা হয়। এই কারাগারে বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। জন্মের সময় বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্তিরূপে দেখতে পান। সেই মূর্তিই এখানে পূজিত হয়।

দ্বারকাধীশ মন্দির: দ্বারকাধীশ অর্থ দ্বারকার অধীশ্বর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। মন্দিরে তাঁরই বিগ্রহের পূজা দেওয়া হয়। পাশে রয়েছে প্রভু নিত্যানন্দের মূর্তি।

রঙ্গভূমি: রঙ্গভূমি অর্থ রণভূমি বা যুদ্ধভূমি। যমুনা তীরের এই স্থানে কংসের সাথে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কংস নিহত হয়। এটি পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত।

বিশ্রাম ঘাট: কংসকে বধ করে পরিশ্রান্ত কৃষ্ণ যমুনাতীরের এই ঘাটে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। যমুনার চব্বিশটি ঘাটের মধ্যে এটি অন্যতম। এখানে পিতৃতর্পণ করলে পিতামাতা স্বর্গবাসী হন এরকম বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

কালীয়নাগ ঘাট: কালীয়নাগ সহস্র ফণাযুক্ত একটি বিষধর সাপ। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে তাকে দমন করে বৃন্দবনবাসীকে রক্ষা করনে। সে কারণে ঘাটের নাম হয়েছে কালীয়নাগ ঘাট।

বাঁকে বিহারী মন্দির: বৃন্দাবনের মন্দিরগুলোর মধ্যে এটি একটি বড় মন্দির। এখানে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি পূজা করা হয়। স্বামী হরিদাস নিধুবনে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি পেয়ে এই মন্দির স্থাপন করেন।

রাধা-দামোদর মন্দির: ষড়-গোস্বামীর অন্তর্গত জীবগোস্বামী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। রাধাকৃষ্ণের যুগলর্মূতি এখানে সেবিত হয়।

শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির: এখানে অনন্ত নাগের উপর শায়িত অবস্থায় ভগবান বিষ্ণুর বিগ্রহ রয়ছে। মন্দিরের দেয়ালে আছে অনেক চিত্র। এখানকার মিউজিয়ামে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্যর নানান মূর্তি স্থান পেয়েছে।

মদনমোহন মন্দির: অনেক উঁচু বেদির উপর অবস্থিত মদনমোহন মন্দির একটি সুদৃশ্য মন্দির। সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে মূল বেদিতে উঠতে হয়। মন্দিরের গায়ে অর্পূব নকশা রয়েছে। এই মন্দিরের পেছনে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমাধি আছে।

নিধুবন: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তদের মিলনভূমি হলো নিধুবন। এখানে কৃষ্ণের সাথে রাধা ও গোপীরা বিরাজ করতেন। পুরো বনটি তুলসী গাছে পূর্ণ।

গোবর্ধন পর্বত: মথুরা তীর্থের মাঝখানে রয়েছে গোবর্ধন পর্বত। এর চারদিকে চক্রাকারে মন্দিরগুলোর অবস্থান। ভক্তরা পায়ে হেঁটে মন্দিরগুলো দর্শন করেন। মন্দিরদর্শনের সমবেত এই যাত্রাকে বলা হয় ব্রজমন্ডল পরিক্রমা। প্রতিবছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এই পরক্রিমা শুরু হয়।

দোলপূর্ণিমা, রাসপূর্ণিমা ও ঝুলনযাত্রা— এই তিনটি উৎসব মথুরা ও বৃন্দাবনের প্রধান উৎসব। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে দোলপূর্ণিমা উৎসব পালতি হয়। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে ঝুলন-যাত্রা উৎসব হয়। আবার, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে রাসপূর্ণিমা হয়। তখন ভারতবর্ষসহ সারা বিশ্বের বৈষ্ণব ভক্ত ও দর্শনার্থীরা এই উৎসবে যোগ দিতে আসেন।

ভারতের যে-কোনো বড় শহর থেকে আন্তঃনগর ট্রেনে বা দূরপাল্লার বাসযোগে মথুরা শহরে যাওয়া যায়। বিমানযোগে যাওয়ার জন্য প্রথমে আগ্রা বিমানবন্দরে নামতে হবে। আগ্রা থেকে মথুরার দূরত্ব মাত্র সাতান্ন কিলোমিটার। ট্যাক্সি বা গণপরবিহণে এই দূরত্ব অতক্রিম করে মথুরায় পৌঁছানো সম্ভব। মথুরা শহর থেকে মূল তীর্থগুলো খুব কাছাকাছি। রিকশা বা অটোতে এই দূরত্ব অতক্রিম করে মথুরা-তীর্থ দর্শন করা যায়।

- শিক্ষার্থীদের অযোধ্যা আর মথুরা সম্পর্কে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে আরও কিছু তথ্য এককভাবে সংগ্রহ করে দলে বা জোড়ায় কিংবা অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে পাঠ্যবইয়ের ২.১২ ছকে লিখতে বলুন। কাজটি বাড়িতেও করতে দিতে পারেন।

হরিদ্বার

ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের হরিদ্বার জেলায় হরিদ্বার তীর্থের অবস্থান। হরিদ্বার অর্থ হরি বা বিষ্ণুর দরজা। অন্যদিকে শিবের ভক্তরা এর নাম দিয়েছেন হরদ্বার। হিমালয় হতে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা যে স্থানে সমভূমিতে প্রবেশ করেছে সেখানেই হরিদ্বার তীর্থের অবস্থান। সপ্ততীর্থের অন্তর্ভুক্ত এই তীর্থ অতি পবিত্র। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, ভগীরথের বংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ষাট হাজার পুত্র কপিল মুনির অভিশাপে পুড়ে মরেন। গঙ্গাজলের পবিত্র স্পর্শে তাঁদের উদ্ধার হবে- এই লক্ষ্যে ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনার জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করেন। সন্তুষ্ট হয়ে দেবী জলধারা রূপে পৃথিবীতে নেমে আসেন। সগরের সন্তানদের দেহাবশেষ গঙ্গাজলে সিক্ত হয়। ফলে তাঁরা উদ্ধার পেয়ে স্বর্গে চলে যান। সে কারণে ভক্তদের বিশ্বাস পবিত্র এই তীর্থে গঙ্গার জলে স্নান করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়। স্বর্গলাভ করা যায়। মহাভারতে পবিত্র এই তীর্থকে স্বর্গদ্বার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গঙ্গার দুই পাড়ে অপরূপ পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী। সৌন্দর্য দেখে মন জুড়িয়ে যায়। মনে এক ধরনের আকর্ষণ বা মায়ার সৃষ্টি হয়। তাই এই তীর্থকে মায়াপুরীও বলা হয়। অন্যদিকে এই তীর্থ দর্শন করে জীবের মোহমায়া কেটে যায়। শাস্ত্রে তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে মায়াপুরী।

গঙ্গার পাড়ে রয়েছে শিবের বিশালাকার বিগ্রহ। দূর থেকে সহজেই যা চোখে পড়ে। বহমান গঙ্গার দুপাশে মাইলের পর মাইল পাথর দিয়ে বাঁধানো। স্থানে স্থানে পারাপারের সেতু ও বাঁধনো ঘাট। ঘাটগুলোর মধ্যে প্র-সিদ্ধ ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট। স্থানীয়রা একে ‘হর কি পৌড়ি’ বলেন। অর্থাৎ হরির প্রস্থান ঘাট। ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত চারটি কুম্ভমেলার স্থানের মধ্যে এটি একটি। পুরাণ অনুসারে, সমুদ্র-মন্থনের শেষে ধন্বন্তরি দেবতা অমৃতকুম্ভ নিয়ে উঠে আসেন। অমৃত হলো এক ধরনের পাণীয় যা খেলে অমরত্ব লাভ করা যায়। আবার কুম্ভ হলো বড় আকারের পাত্র। অমৃতের সুরক্ষার্থে ভগবান নারায়ণ তা নিয়ে অন্যত্র রওনা দেন। তখন বিন্দু-পরিমাণ অমৃত কুম্ভ হতে হরিদ্বারের এই স্থানে পতিত হয়। কুম্ভ থেকে অমৃত পতিত হওয়ার কারণে মেলার নামকরণ হয়েছে কুম্ভমেলা। প্রতি বারো বছর পরপর এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সূর্য ও বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে অবস্থান করলে হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে সন্ধ্যার সময় গঙ্গাদেবীর আরতি হয়। ভক্তরা গাছের পাতার ছোট নৌকায় অর্ঘ্য সাজিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেন। সারাঘাট তখন আলোকময় হয়ে ওঠে। সেই দৃশ্য অতি মনোরম।

ভারতবর্ষের বড় বড় শহরগুলো থেকে বাসযোগে সরাসরি হরিদ্বার যাওয়া যায়। ট্রেনে যেতে হলে বড় শহরের স্টেশন থেকে হরিদ্বার স্টেশনে নামতে হবে। হরিদ্বার স্টেশন থেকে তীর্থের দূরত্ব বিশ কিলেমিটার। বিমানে যেতে হলে বড় বড় শহরের বিমান বন্দর থেকে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন নামতে হবে। দেরাদুন থেকে হরিদ্বারের দূরত্ব একান্ন কিলোমিটার। অটোরিকশায় এই দূরত্ব অতিক্রম করে সহজেই হরিদ্বার পৌঁছানো সম্ভব।

বারাণসী

ভারতের উত্তরপ্রদেশের বারাণসী জেলায় বারাণসী তীর্থের অবস্থান। আসলে গঙ্গানদীর দুটি উপনদী ‘বরুণ’ ও ‘অসি’- যা মিলে গঠিত হয়েছে বারাণসী। গঙ্গার সাথে নদী দুটির মিলনের মধ্যবর্তী পবিত্র ভূমিই বারাণসী। বারাণসীর অন্য নাম কাশী। কাশী তীর্থ দর্শন করে মানুষের মোহ নাশ হয়। ভ্রান্ত জ্ঞান দূর হয়ে হৃদয় আলোকিত হয়। তাই এর নাম কাশী। মহাদেব কখনও এই পবিত্র স্থান ছেড়ে চলে যান না। তাই এই তীর্থের নাম দেওয়া হয়েছে অবিমুক্ত।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

তীর্থের শহর বারাণসীতে ছোট-বড় মিলে প্রায় তেইশ হাজার মন্দির রয়েছে। তাই একে হিন্দুদের ধর্মীয় রাজধানী বলা হয়। মন্দিরগুলোর মধ্যে 'কাশী বিশ্বনাথ মন্দির' অন্যতম। এখানে শিবলিঙ্গের পূজা করা হয়। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে যা অন্যতম। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য মহাদেব তাঁদের মাঝে জ্যোতির্ময় লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হন। তাঁরই প্রস্তরীভূত রূপ জ্যোতির্লিঙ্গ। এখানে মহাদেব সর্বদা বিরাজ করেন বলে বিশ্বাস করা হয়। পূজার পাশাপাশি এখানে বৈদিক মন্ত্র পাঠ হয়, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়া এক হাজার কেজি ওজনের সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো। পাশে জ্ঞানবাপী নামে এক কুণ্ড রয়েছে। কুণ্ডের জলে স্নান করলে মূর্খেরও জ্ঞান লাভ হয়— এমন বিশ্বাস ভক্তদের রয়েছে।

সঙ্কট-মোচন মন্দির বারাণসীর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির। সঙ্কট থেকে মুক্তি দেন মহাবীর হনুমান। তাঁর নাম অনুসারে মন্দিরটির নামকরণ। হনুমানসহ এখানে রাম-সীতা পূজিত হন। তুলসীমানস মন্দির এখানকার একটি বড় মন্দির। হিন্দিভাষায় রামায়ণ রচয়িতা তুলসীদাসের নামে এই মন্দির। মন্দিরের নানা কক্ষে রামায়ণের কাহিনিকে শিল্পকর্মে মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। দেয়ালে লেখা রয়েছে রামায়ণের শ্লোক। রাম, সীতা ও হনুমানের পাশাপাশি এখানে তুলসীদাসেরও পূজা করা হয়। আবার, উত্তরবঙ্গের নাটোরের (বর্তমান বাংলাদেশের) রাণী ভবাণী এখানে একটি দুর্গামন্দির নির্মাণ করেন। সেখানে দশভুজা দুর্গাদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির। নানা অলঙ্কারে ভূষিতা অন্নপূর্ণা দেবীকে এখানে পূজা করা হয়। দেবীর কৃপায় কাশীতে কোন মানুষ খাবারের কষ্ট পান না— এমন লোকশ্রুতি রয়েছে।

বারাণসী তীর্থের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে পবিত্র গঙ্গা। গঙ্গাতীরে মোটিএকাশিটি ঘাট রয়েছে। দশাশ্বমেধ একটি উল্লেখযোগ্য ঘাট। পিতামহ ব্রহ্মা এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। 'দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করলে মোক্ষ লাভ হয়'- মহাভারতে এমনটি বলা হয়েছে। আবার, মণিকর্ণিকা ঘাটে শিবের কানের অলংকারের 'মণি' পড়েছিল। সতীর শবদেহ নিয়ে নৃত্য করার সময়ে এই ঘটনা ঘটে। তাই এর নাম মণিকর্ণিকা ঘাট। দানবীর হরিশ্চন্দ্রের নামে নির্মিত হয়েছে হরিশ্চন্দ্র ঘাট। হরিশ্চন্দ্র ও দশাশ্বমেধ ঘাটের পাশেই কাশীর দুটি মহাশ্মশান। এখানে শবদাহ করলে মৃত ব্যক্তির দিব্যলোক প্রাপ্তি হয় বলে ভক্তদের বিশ্বাস। অন্যদিকে অসি নদী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে তৈরি হয়েছে অসিঘাট। এটিও পবিত্র তীর্থ।

ঘাটগুলোতে গঙ্গাদেবীর সন্ধ্যা-আরতির দৃশ্য অতি চমৎকার। গঙ্গার ঘাটে সুসজ্জিত মঞ্চ নির্মিত হয়। ধুনুচিতে নানা সুগন্ধি দ্রব্য পোড়ানো হয়। আরতির জন্য নির্দিষ্ট ঝাড়-প্রদীপ জ্বালানো হয়। তারপর সুসজ্জিত পুরোহিতেরা প্রদীপ হাতে নিয়ে বাজনার তালে মঞ্চে নেচে নেচে গঙ্গার আরতি করেন। মনোরম দেই দৃশ্য দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ ভক্ত সেখানে সমবেত হন। ঘাটে জায়গা না পেয়ে কেউবা নৌকায় চড়ে গঙ্গাবক্ষে বসে আরতির দৃশ্য উপভোগ করেন।

বারাণসীর দুটি বড় উৎসব হলো মহাশিবরাত্রি উৎসব এবং গঙ্গা-উৎসব। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের হয়। গঙ্গাবক্ষে আরতি হয়। আবার লঙ্কাজয় শেষে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে গঙ্গা-উৎসব পালিত হয়। এই দিন লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে মাটির পাত্রে করে গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। অমাবস্যার অন্ধকারে এই দৃশ্য দেখে মন জুড়িয়ে যায়।

ভারতের যে-কোনো বড় শহর থেকে ট্রেনে কিংবা বাসে চড়ে বারাণসীতে পৌঁছানো যায়। স্টেশনগুলো থেকে মূল তীর্থের দূরত্ব পাঁচ-ছয় কিলোমিটারের মধ্যে। বিমানযোগে যেতে হলে প্রথমে বারাণসীর লালবাহাদুর শাস্ত্রী

বিমান বন্দরে নামতে হবে। সেখান থেকে মূল তীর্থের দূরত্ব পঁচিশ কিলোমিটার। অটোরিকশা বা ট্যাক্সিতে এই দূরত্ব অতিক্রম করে মূল তীর্থ দর্শন করা সহজেই সম্ভব।

- শিক্ষার্থীদের চারটি তীর্থস্থান সম্পর্কিত পাঠ্যবইয়ের ২.১৩ ছকটি পূরণ করতে বলুন। কাজটি বাড়িতেও করতে পারে।

বিশ্বময় হিন্দুধর্ম

কেবল ভারতীয় উপমহাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী হিন্দুধর্মের অনেক অনুসারী আছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তারা চমৎকার স্থাপনার অনেক মন্দির তৈরি করেছেন। এবারে আমরা সেইসব মন্দির এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানব।

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখে (ছক ২.১৪) দলে/ জোড়ায় মন্দিরগুলোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে উপস্থাপন করতে বলুন।

পন্ডিত চাণক্য বলেছেন ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’। এ পৃথিবীতে সবাই সবার আত্মীয়। হিন্দুধর্ম এই বিশ্বজনীন ধারণাকে সমর্থন করে। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন প্রার্থনায় সারা বিশ্বের সকল অস্তিত্বের মঙ্গল কামনা করা হয়।

সপ্তসিন্ধুর অববাহিকায় বিকশিত হওয়া হিন্দুধর্ম একটা সময় উপমহাদেশের গন্ডি পেরিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব অঞ্চলে হিন্দু রাজাদের নেতৃত্বে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ ভারতের কলিঙ্গ, চোল ও বিজয়নগরের রাজারা সমুদ্র অভিযানে উৎসাহ দিতেন। এঁদের উৎসাহে এসব রাজ্যের বণিকরা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাণিজ্য বিস্তার করতে থাকে। এদের মাধ্যমে বর্তমান কম্বোডিয়া থাই-ল্যান্ড মায়ানমার মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেয়িশায় হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটে। এখনো এসব অঞ্চলে হাজার হাজার প্রাচীন হিন্দু মন্দির রয়েছে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে নিয়মিত প্রাচীন মন্দিরসমূহ আবিস্কৃত হচ্ছে।

বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপকে একসময় যব দ্বীপ বলা হত। জাভা ধান চাষের জন্য খুব উর্বর ভূমি ছিল। এখানে প্রচুর ধান হতো। পার্শ্ববর্তী দ্বীপ থেকে বিভিন্ন মশলা নিয়ে আসা হতো ধান কেনার জন্য। আবার ভারত ও আরব থেকে বণিকরা এখানে আসত মশলা কিনে নেয়ার জন্য। এভাবে ভারতীয়রা এ অঞ্চলে যায়।

রাধেন বিজয় নামের এক হিন্দু রাজপুত্র মঙ্গোলিয়া থেকে আসা দখলদার থেকে জাভাকে মুক্ত করে ১২৯৪ সালে মাজাপাহিট রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে গজমদ নামের এক হিন্দু সেনাপতির নেতৃত্বে এ সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃতি লাভ করে। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝিতে মাজাপাহিট সাম্রাজ্য পাপুয়া নিউগিনি থেকে মালয় দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। বর্তমান ইন্দোনেশিয়া দেশটি মূলত এই রাজবংশের সময় গঠিত হয়। আজকের মালয়েশিয়াও সেসময় এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৩৯৮ সালে মাজাপাহিট সাম্রাজ্য প্রতিবেশী আরেকটি সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে। সুমাত্রার শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য। শ্রী-

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিজয়ার রাজার ঘাঁটি ছিল বর্তমানের সিঙ্গাপুরে। সেখান থেকে পিছু হটে রাজা প্রেমেশ্বর মালাক্কা দ্বীপে চলে যান।

এদিকে মাজাপাহিট রাজবংশ নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে দুর্বল হতে থাকে। একসময় শেষ মাজাপাহিট রাজা পশ্চিমের দিকে পালিয়ে গিয়ে মাউন্ট লাউয়ের এক হিন্দু মন্দিরে আশ্রয় নেন। এই রাজনৈতিক শূন্যতায় এ অঞ্চলে অন্য ধর্মের প্রসার শুরু হয়। এখনো ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে প্রায় ৯০ ভাগ জনগোষ্ঠী হিন্দুধর্মাবলম্বী। ইন্দোনেশিয়া নামটির সৃষ্টি ইন্ডিয়া ও এশিয়া দুটো শব্দের সংশ্লেষে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় প্রতীক ও মূলনী-তিতে এখনো হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

মাজাপাহিট সাম্রাজ্যের আগে অষ্টম শতাব্দীতে জাভা ও মালয় নিয়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য ছিল। ১০২৫ সালে চোল সাম্রাজ্যের আক্রমণে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পরাজয় ঘটে। দিন দিন সাম্রাজ্যটি দুর্বল হয়ে পড়ে।

নবম শতাব্দীতে হিন্দু রাজা জয়বর্মণের নেতৃত্বে কম্বোডিয়ায় বর্তমান খেমার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্দশ শতকে রাজা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে হিন্দু সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষ এখনো হিন্দু দেব-দেবীর পুজা করে।

সিঙ্গাপুর শব্দটি সংস্কৃত সিংহপুর শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ সিংহের নগর। সাং নিলা উতামা এই রাজ্যটির পত্তন ঘটান। মিয়ানামারের পূর্বনাম ছিল ব্রহ্মদেশ। কথ্যরূপে বার্মা বলা হত। সেখানে কিছু হিন্দু রাজ্য ছিল। ভি-য়েতনামে চম্পারাজ্য নামে একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। জাপান, কোরিয়া ও ফিলিপাইনের সংস্কৃতিতেও হিন্দুধর্মের ।নযে পরূতপ্রি ররবেকুে ও শণগে ,প্রভাব লক্ষ করা যায়। জাপানের দেবদেবী যথাক্রমে হিন্দু দেবদেবী সরস্বতী

এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর নাম এখনো হিন্দু ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করে যাচ্ছে। যেমন আফগানিস্তানের পূর্বনাম ছিল উপগণস্থান। কান্দাহার ছিল মহাভারতের উল্লিখিত গান্ধার রাজ্য। কম্বোডিয়ার নাম ছিল কম্বোজ। পেশোয়ার এসেছে পুরুষপুর থেকে। একইভাবে লাহোর লবপুর, কাশ্মীর কাশ্যপপুরী, মালয়েশিয়া মলয়দেশ, তিব্বত ত্রিবিষ্টপ থেকে এসেছে।

প্রাচীনকালে হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বতমালা এবং সাগর-মহাসাগরের কারণে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পৃথিবীর অন্যা-ন্য অঞ্চলে যেত না। ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় অন্য অঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজনও তেমন অনুভূত হত না। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যবসা বাণিজ্য চাষাবাস রেললাইন স্থাপনের জন্য ভারত থেকে প্রচুর হিন্দুধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী আফ্রিকা আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মিয়ানামার, মরিশাস, ফিজি, গুয়ানা, সুরিনাম, কাতারে, আরব আমিরাতে হিন্দু জনগোষ্ঠী বসবাস করেন।

প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে প্রতিষ্ঠিত কিছু উল্লেখযোগ্য মন্দিরের বর্ণনা করা হলো।

ইন্দোনেশিয়ার প্রম্বানান মন্দির

ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের যোগজাকার্তা রাজ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। প্রাচীন জাভার বৃহত্তম এ হিন্দু মন্দিরটি নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি তৈরি হয়েছিল। এ মন্দিরের অদূরেই পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধ মন্দির বরবুদুর স্থাপন করেছিল শৈলেন্দ্র রাজবংশ। এই রাজবংশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে প্রতিবেশী সঞ্জয় রাজবংশ এটি স্থাপন

করেছিল বলে ধারণা করা হয়।

এটি মূলত একটি মন্দির কমপ্লেক্স। ৮টি ১৫৪ ফুট উঁচু মন্দিরকে কেন্দ্র করে এখানে ২৪০ টি মন্দির ছিল। অনেক মন্দির নষ্ট হয়ে গেলেও ৮ টি বড় মন্দির এখনো টিকে আছে। এসব মন্দিরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পুজা করা হয়।

এই মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি সন্ধ্যায় রামায়ণের উপর গীতিনাট্য উপস্থাপন করা হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার বিদেশী এই গীতিনাট্য দেখতে আসে।

কম্বোডিয়ার আঙ্কারওয়াট মন্দির

কম্বোডিয়ার আঙ্কোর ওয়াট হল প্রম্বানান মন্দিরের মতো একটি মন্দির কমপ্লেক্স। ১৬২.৬ হেক্টর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ কমপ্লেক্স গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় কাঠামো হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দ্বাদশ শতকে রাজা সূর্যবর্মণ দেবতা বিষ্ণুকে উৎসর্গ করে এ মন্দিরটি স্থাপন করেন। পরে এটি বৌদ্ধ মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এটি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আঙ্কোর ওয়াটের আক্ষরিক অর্থে 'রাজধানী মন্দির'। এই মন্দির কমেপ্লেক্স করতে সাতাশ ছর সময় লেগেছিল।

মালয়েশিয়ার বাটু কেভ

বাটু শব্দের অর্থ পাথর। পাথুরে গুহার একটি নেটওয়ার্ক এই বাটু কেভ। এখানে ১৪০ ফুট উচু মারুগানের মূর্তি আছে। ১৮৯০ সালে তামিল ব্যবসায়ী কে. থামবুসামি পিল্লাই এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মূর্তিকে কেন্দ্র করে শ্রী সুব্রামানিয়াম স্বামী দেবস্থানম নামে একটি মন্দির আছে। বর্তমানে এটি মালয়েশিয়ার একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এখানে থাইপুসাম নামে বিখ্যাত হিন্দু উৎসব পালিত হয়। এতে যোগ দিতে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর থেকে পর্যটকরা অংশ নেন।

ইন্দোনেশিয়ার তানাহ লট মন্দির

ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে সমুদ্রতীর ধরে সাতটি মন্দির সারিবদ্ধভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। স্থানীয় ভাষায় তানাহ লট অর্থ সমূদ্রের ভূমি। সমুদ্র তীরবর্তী একটি পাথরের উপর মন্দিরটি অবস্থিত। এটি বালির অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন স্থান। ধারণা করা হয়

হিন্দুধর্ম গুরু ডাং হায়াং নিরর্থ ষোড়শ শতকে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার পূজিত দেবতা বরুণ।

মরিশাসের শিব সাগর মন্দির

মরিশাসের পূর্ব প্রান্তে এই মন্দিরটি অবস্থিত। ২০০৭ সালে বিকাশ গুনোয়া এই মন্দির স্থাপন করেন। এখানে ১০৮ ফুট উচু ব্রোঞ্জের শিবের বিগ্রহ আছে। মন্দিরটি চারদিক থেকে লেক ও ম্যানগ্রোভ বন দ্বারা বেস্টিত। খুব দৃষ্টিনন্দন এর নিসর্গ।

এছাড়া মালয়েশিয়ার জোহর বাহরুর আরুলমিগু শ্রী রাজাকালিয়াম্মান কাচের মন্দির, ইংল্যান্ডের শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর (বালাজি) মন্দির, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাধা মাধব ধাম, ওমানের মাস্কাটের শ্রী কৃষ্ণ মন্দির, বার্মার ইয়াগুন শ্রী কালী মন্দির, ফিজির শ্রী শিব সুব্রামনিয়া মন্দির, অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ার শ্রী শিব বিষ্ণু মন্দির উল্লেখযোগ্য।

- শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় পাঠ্যবইয়ে থাকা পৃথিবীর মানচিত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হিন্দুদের অবস্থান ও সংখ্যা প্রকাশ করতে বলুন (একটি নির্দিষ্ট রঙের ডট (.) দিয়ে অবস্থান ও সংখ্যা প্রকাশ করবে। দেশটির মোট জনসংখ্যার তুলনায় হিন্দু জনগোষ্ঠী কত শতাংশ সে অনুযায়ী ডট কম-বেশি হবে। একই সঙ্গে সংখ্যাটি লিখেও দেবে)।

ধাপ ৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ২ টি

- বিভিন্ন দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী কীভাবে তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো পালনের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন রক্ষা করছে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় তথ্য সংগ্রহ করে ইনফোগ্রাফিক্সের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন।
- তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তাদের বিদেশে থাকা আত্মীয়-পরিচিতজনদের চিঠি লেখা, মেইল করা, মেসেজ দেওয়া বা কল করতে উৎসাহিত করুন। বিদেশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো; বিশেষ করে যেসব মন্দিরগুলোর কথা তারা জানল সেসব মন্দির এবং অন্যান্য বিদেশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে ইমেইল ঠিকানা সংগ্রহ করে মেইল করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন। এসবের বাইরে অন্যান্য মাধ্যম থেকেও শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন।
- বিভিন্ন দেশের পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে, সেই দেশের পতাকা, মানচিত্র, প্রতীক ইত্যাদি অনুষঙ্গ সঙ্গে নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে/ জোড়ায় ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে সেই দেশের ধর্মীয় উৎসবগুলো কীভাবে পালিত হয় তা উপস্থাপন করবে।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট ছকে (২.১৫), বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় উৎসব উপস্থাপনের জন্য কী কী প্রয়োজন তার তালিকা করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ৬: নৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ জীবনচরিত

যোগ্যতা ৯.৩

হিন্দুধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-

- হিন্দুধর্মীর কাহিনির মাধ্যমে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ এবং হিন্দুধর্মীয় আদর্শ জীবনচরিত সম্পর্কে জানা
- হিন্দুধর্মীয় মহামানবদের প্রবর্তিত আদর্শ ধারণ করা
- নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা এবং মহামানবদের আদর্শ ধারণ করার মাধ্যমে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।

বিষয়বস্তু

সততা, সৎসাহস, বিবেকবোধ, সৌজন্যবোধ, মৈত্রেয়ী, শ্রীচৈতন্য, বামাক্ষেপা, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুচাঁদ ঠাকুর, স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী এবং শ্রীমা

অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা এককভাবে নিজেদের জীবনে করা পাঁচটি ভালো কাজের তালিকা তৈরি করবে। তারপর দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে সবার কাজের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো পাঁচটি কাজ বেছে নেবে। এই ভালো কাজগুলোতে তাদের যেসব মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে তা খুঁজে বের করে তালিকা করবে।

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের কাজ, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে সততা, সৎসাহস, বিবেকবোধ, সৌ-জন্যবোধ, মৈত্রেয়ী, শ্রীচৈতন্য, বামাক্ষেপা, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুচাঁদ ঠাকুর, স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী এবং শ্রীমা সম্পর্কে ধারণা দিন। শিক্ষার্থীরা এলাকার মন্দির পরিদর্শন করবে। সেখানে কী কী মানবকল্যাণমূলক কাজ দেখতে পেয়েছে এবং আর কী কী করা যায় তা প্রতিফলন জার্নালে লিখে রাখবে। সবার প্রতিফলন জার্নাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, মন্দিরের মাধ্যমে আর কী কী মানবকল্যাণমূলক কাজ করা যায়, দলে/ জোড়ায় তার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ণ করবে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ১০ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

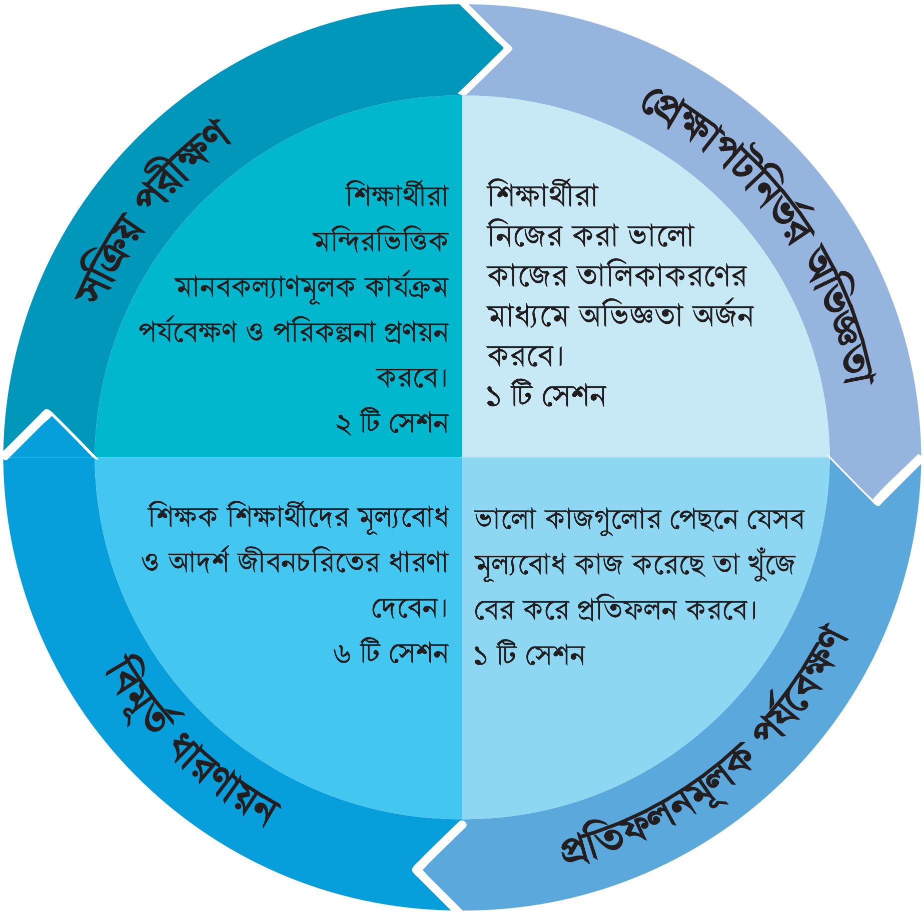

ধাপ ১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, যে কাজটি আমরা নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে কেবল অন্যকে আনন্দ দেওয়া বা অন্যের মঙ্গলের জন্য করি, সেটি একটি ভালো কাজ। প্রতিটি মানুষই ভালো কাজ করে। যে মানুষ যত বেশি ভালো কাজ করে সে তত ভালো মানুষ।
- পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট স্থানে (ছক ৩.১) শিক্ষার্থীদের নিজেদের জীবনে করা এরকম পাঁচটি ভালো কাজের তালিকা তৈরি করতে বলুন।

ধাপ ২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ১ টি

- দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের সবার কাজের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো পাঁচটি কাজ বেছে নিতে বলুন। এই ভালো কাজগুলোতে তাদের কোন কোন মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে তা খুঁজে বের করে পাঠ্যবইয়ের তালিকাটি (৩.২) সম্পূর্ণ করতে বলুন।
- যদি এমন হয়, শিক্ষার্থীরা বর্ণনা দিতে পারছে কিন্তু মূল্যবোধের নাম বলতে পারছে না, তাহলে তাদের সামান্য সূত্র দিয়ে সাহায্য করুন। সরাসরি না বলে দিয়ে আগের শ্রেণিগুলোর পাঠের আলোকে খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করুন।

ধাপ ৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ৬ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, এই যে ভালো ভালো কাজগুলো তোমরা করেছ, এর মধ্য দিয়ে তোমাদের মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে। হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থ এবং হিন্দুধর্মের মহামানবদের জীবন থেকে আমরা এরকম অনেক মূল্যবোধের শিক্ষা পাই।
- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে সততা, সৎসাহস, বিবেকবোধ, সৌজন্যবোধ, মৈত্রেয়ী, শ্রীচৈতন্য, বামাক্ষেপা, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুচাঁদ ঠাকুর, স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী এবং শ্রীমা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সামনে তথ্য উপস্থাপন করুন।

সহায়ক তথ্য

নৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ জীবনচরিত

সততা

সৎ চিন্তা করা, সৎ কাজে নিযুক্ত থাকা, সত্যকে গোপন না করা, মিথ্যাকে প্রশ্রয় না দেওয়া, কোনো অন্যায় বা অবৈধ কাজ না করা, কারো জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ না করাই হচ্ছে সততা। সততাই মানুষকে অন্য মানুষের নিকট বিশ্বস্ত করে তোলে। সততা মানবজীবনে শান্তি ও স্বস্তি এনে জীবনকে করে তোলে আলোকিত। মানুষকে নিয়ে যায় মর্যাদার পথে, গৌরবময় স্থানে। সততা ধর্মের অঙ্গ এবং একটি নৈতিক গুণ।

আমরা সততা সম্পর্কে মহাভারতের একটি কাহিনি জানব।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একসময়ে দ্রোণাচার্য কৌরবদের সেনাপতি হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়লে তাকে বধ করার জন্য পান্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। দ্রোণাচার্য এভাবে যুদ্ধ করলে পান্ডবদের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হবে। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন, কৌশল ছাড়া গতি নেই। তাই তিনি ভীমকে বললেন, পাণ্ডবমিত্র রাজা ইন্দ্রবর্মার হাতি অশ্বত্থামাকে বধ করে সেটা প্রচার করতে। প্রিয় পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে দ্রোণাচার্য অস্ত্র ত্যাগ করলে অর্জুন যেন সেই সুযোগে তাঁকে বধ করেন। কিন্তু অর্জুন বললেন, হে মাধব,

আমাকে ক্ষমা করুন। ছলনার আশ্রয় নিয়ে গুরুকে বধ করার পাপ আমি করতে পারব না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেন, তোমার একমাত্র লক্ষ্য অধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তুমি কেবল সেটিই করো।

ভীম গদা দিয়ে হাতি অশ্বত্থামাকে বধ করে দ্রোণাচার্যকে জানান, আমি এই গদা দিয়ে অশ্বত্থামাকে বধ করেছি। কিন্তু দ্রোণাচার্য তার কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন, একমাত্র ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মুখে শুনলেই আমি একথা বিশ্বাস করব। কারণ যুধিষ্ঠির ধার্মিক এবং সৎ। তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। কিন্তু সকলের অনুরোধে যুধিষ্ঠিরও তখন সততা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তিনি দ্রেণাচার্যকে বললেন, অশ্বত্থামা হতঃ- ইতি গজ। 'ইতি গজ' কথাটি তিনি এত আস্তে বললেন যেন দ্রোণাচার্যর কানে তা না পৌঁছোয়। তাতে সত্য বলাও হলো আবার উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হলো। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে শোকবিহ্বল দ্রোণাচার্য তপস্যায় বসলেন। পুত্রের আত্মাকে খুঁজতে পিতার আত্মা দেহ ছেড়ে স্বর্গে প্রবেশ করল। এই সুযোগে দ্রৌপদীর বড় ভাই, পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন তলোয়ার দিয়ে দ্রোণাচার্যর প্রাণহীন দেহ থেকে মাথা কেটে ফেলেন। যুধিষ্ঠির শোক ও অনুতাপে মূহ্যমান হয়ে পড়েন। তিনি জীবনে এই একটিবারমাত্র সততাভ্রষ্ট হয়েছেন। দ্রৌপদী বললেন, পাণ্ডবেরা পাশাখেলায় পরাজিত হলে কৌরবেরা যখন আমার বস্ত্রহরণ করতে উদ্যত হয়েছিল, দ্রোণাচার্য তখন নিশ্চুপ ছিলেন। তাই প্রাণদণ্ডের শাস্তিই তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু এই সান্ত্বনায়ও যুধিষ্ঠিরের সততা থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার অনুতাপ গেল না।

সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা কখনও মাটি স্পর্শ করত না। কিন্তু দ্রোণাচার্যের সাথে ছলনা করার কারণে সেদিন থেকে যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা সকলের মত মাটি ছুঁয়েই থাকছে। ধর্মনিষ্ঠার বলে যুধিষ্ঠির জীবন্ত অব-স্থায় স্বর্গে গিয়েছেন। স্বর্গের সবচেয়ে সম্মানজনক আসনে বসেছেন। কিন্তু কোনো অর্জন তাঁর এই সততাভ্রষ্ট হওয়ার পাপ মুছতে পারেনি। তাই স্বর্গারোহনের পরেও তাকে নরক দর্শন করতে হয়েছে। তাই সবারই উচিত সততার সঙ্গে জীবন কাটানো।

- শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় (ছক ৩.৩) একজন সৎ মানুষের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে তার মধ্য থেকে পাঁচটি লিখতে বলুন।

সৎসাহস

'সাহস' শব্দের অর্থ ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা। 'সৎ' শব্দের অর্থ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। সুতরাং সৎসাহস হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের জন্য অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। নিজের জীবনে ঝুঁকি আছে জেনেও কল্যাণকর কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া, দেশ বা অন্যের মঙ্গলের জন্য সাহস প্রদর্শন করাকেই বলে সৎসাহস।

যদি কোনো সবল ব্যক্তি দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে তখন সৎসাহসী নির্ভয়ে দুর্বলের পাশে দাঁড়ান। তাকে রক্ষা করেন। সৎসাহস মানুষের একটি বিশেষ নৈতিকগুণ। সৎসাহস ধর্মের অঙ্গ। হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থে আমরা অনেক সৎসাহসী চরিত্রকে পাই। আমরা মহাভারত থেকে বীরযোদ্ধা অভিমন্যুর সৎসাহসের উপাখ্যান জানব।

হস্তিনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। সেখানে কুরুবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশের একজন রাজা ছিলেন বিচিত্রবীর্য। তাঁর ছিল দুই পুত্র- ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র বড় কিন্তু তিনি ছিলেন জন্ম থেকে অন্ধ। তাই ছোট ভাই পাণ্ডু রাজা হলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী। তাঁদের দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রভৃতি নামে শতপুত্র এবং দুঃশলা নামে এক কন্যা ছিল। কুরুবংশের নাম অনুসারে এদের বলা হয় কৌরব।

অন্যদিকে পাণ্ডুর দুই স্ত্রী- কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন এবং মাদ্রীর পুত্র নকুল ও সহদেব। পাণ্ডুর নাম অনুসারে এদেরকে বলা হয় পাণ্ডব। রাজ্যের অধিকার নিয়ে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।

পিতামহ ভীষ্মকে দুর্যোধন কৌরব পক্ষের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাছাড়া অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, অঙ্গরাজ কর্ণ এরাও কৌরবপক্ষে যোগ দেন। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন দুই পক্ষে ভাগ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

যাদবরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিপুল সংখ্যক নারায়ণী সেনাকে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে পাঠান। আর নিজে যোগ দেন পাণ্ডবপক্ষে। তবে তিনি সরাসরি যুদ্ধ করেননি। তিনি ছিলেন অর্জুনের রথের সারথি।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে অর্জুন কৌরবদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিলেন। তখন দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের সাথে পরামর্শ করে চক্রব্যূহ রচনা করেন। চক্রব্যূহ হচ্ছে চক্রাকারে সৈন্য সাজানো। এতে ঢোকার এবং বের হওয়ার একটিমাত্র পথ থাকে। এই ব্যূহ ভেদ করা খুব কঠিন। ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষের বড় বড় যোদ্ধা এই ব্যূহ ভেদ করতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণের বোন সুভদ্রা এবং অর্জুনের পুত্র ছিলেন অভিমন্যু। অভিমন্যু তখন মাত্র ষোল বছরের বালক। তাছাড়া তিনি ব্যূহতে প্রবেশের কৌশল জানতেন কিন্তু বের হওয়ার কৌশল জানতেন না। শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করবেন না। অর্জুন অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত। আবার কেউ একজন এগিয়ে না গেলেও পাণ্ডবদের পরাজয় হবে। তখন যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে বললেন, তুমি যাও চক্রব্যূহ ভেদ করো। আমরা সৈন্যদল নিয়ে তোমাকে বের করে আনবো।

সাহসী অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকলেন। তাঁর তীরের আঘাতে কৌরবদের বিপুল সেনা নিহত হলো। নিহত হলো মহাবীর শল্যের ভাই, দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণসহ অনেক যোদ্ধা। তখন দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও শকুনি এই সাত মহাযোদ্ধা অভিমন্যুর সাথে যুদ্ধ শুরু করলেন। তাঁরাও সাতবার পরাজিত হলেন। এরপর এই সাতজন যোদ্ধা একসাথে চারদিক থেকে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। এই মিলিত আক্রমণে অভিমন্যুর অস্ত্র, রথ— সব ধ্বংস হলো। তখন তিনি রথের চাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করলেন। অবশেষে যুদ্ধ করতে করতে নির্ভয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন সৎসাহসী অভিমন্যু।

- ‘সৎসাহস’ বলতে শিক্ষার্থী যা বোঝে তা কয়েকটি পয়েন্টে (ছক ৩.৪) লিখতে বলুন।

বিবেকবোধ

‘বিবেকবোধ’ কথাটির মানে বিচার-বিবেচনা করার বোধ। ন্যায়-অন্যায়কে আলাদা করে সেই অনুযায়ী আচরণ করার ক্ষমতা। একটি ছোট্ট শিশু কেবল নিজের প্রয়োজন, সুবিধ-অসুবিধাটুকু বোঝে। অন্য কারোর কথা ভাবার বোধ তার মধ্যে তৈরি হয় না। কোনটা ভালো-কোনটা মন্দ, কোনটা উচিত- কোনটা অনুচিত— তাকে বারেবারে বুঝিয়ে দিতে হয়। কিন্তু বড় হওয়ার পর যখন সে নিজেই উচিত-অনুচিতের তফাৎ করতে পারে, কেবল নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে অন্যের কথাও ভাবতে শেখে তখন আমরা তাকে বিবেকবান মানুষ বলি।

মহাভারতের উজ্জ্বল চরিত্র যুধিষ্ঠিরকে আমরা একজন বিবেকবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে পাই। তার বিবেকবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এরকম অনেক কাহিনি আছে। সেগুলোর মধ্য থেকে একটা তোমাদের শোনাই।

যুধিষ্ঠির তখন হস্তিনাপুরের রাজা। তিনি অভিমন্যু ও উত্তরার ছেলে পরীক্ষিতকে রাজা করে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ তিনি জেনেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ করেছেন। দ্রৌপদী আর বাকি পাণ্ডবরা নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি, সকল অলংকার, দামি পোশাক সবকিছু ত্যাগ করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হলেন। যাত্রাপথে তাদের একট কুকুরের সাথে তাদের দেখা হয়। কুকুরটিও এই ছয় জনের সঙ্গী হলো। পর্বত-মরুভূমি অতিক্রম করে তাঁরা বহু দীর্ঘ পথ হাঁটতে লাগলেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পথে দ্রৌপদী দেহত্যাগ করলেন। এরপর একে একে সহদেব, নকুল, অর্জুন এবং সবশেষে ভীমও মারা গেলেন। বাকি থাকলেন কেবল যুধিষ্ঠির ও তাঁর অনুগত কুকুরটি। যুধিষ্ঠির তাঁর যাত্রা চালিয়ে যান। অবশেষে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র রথে চেপে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নেমে আসেন। যুধিষ্ঠির তখন কুকুরটিকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাতে বাধা দেন। বলেন, যাঁর সাথে কুকুর থাকে তিনি স্বর্গে যেতে পারেন না । কিন্তু যুধিষ্ঠির বলেন, আমার ভাইয়েরা আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু কুকুরটি আমার সঙ্গে সবসময় ছিল। তাকে এখানে রেখে একা স্বর্গে চলে যাওয়া মহাপাপের কাজ হবে। যুধিষ্ঠির কুকু-রটিকে রেখে স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর কথা শুনে ধর্মদেবতা কুকুরের রূপ ছেড়ে নিজের রূপে দেখা দিলেন। যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তোমার সমান বড় স্বর্গে আর কেউ নেই।

স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন, তাঁর ভাইয়েরা বা দৌপদী— কেউই সেখানে নেই। তিনি জানতে পারলেন, এঁরা সবাই নরকে অবস্থান করেছ। তিনি স্ত্রী আর ভাইদের অবস্থা দেখার জন্য নরকে যান। সেখানে তাদের করুণ অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠিরও আর স্বর্গসুখ ভোগ করতে চাননি। তিনি সকলের সঙ্গে থেকে নরকের দুঃখভোগ করাকেই শ্রেয় বলে মনে করলেন। শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির সবাইকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে ফিরে এলেন।

- যুধিষ্ঠিরের কোন কোন আচরণে শিক্ষার্থী বিবেকবোধের পরিচয় পাচ্ছে এবং কীভাবে, গল্পটি থেকে শিক্ষার্থী নিজের জন্য কী শিখল তা পাঠ্যবইয়ের ৩.৫ ছকে লিখতে বলুন।

সৌজন্যবোধ

‘সৌজন্যবোধ’ কথাটির অর্থ ভদ্রতা বা শিষ্ট আচরণ। এই ভদ্রতা ভাণ করে আসা নয়। সৌজন্যবোধ সম্পন্ন মানুষ ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ না করে সবাইকে আন্তরিকভাবে সম্মান করেন। সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করেন। তিনি অন্যের কাজে সামান্যতম উপকৃত হলেও কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেন না। ভুল করলে দুঃখ প্রকাশ করতে লজ্জিত হন না। অন্যায় করে ফেললে ক্ষমা প্রার্থনা করতে কুণ্ঠিত হন না। মূলত মানুষের মধ্যকার সৌজন্যবোধ অনেকগুলো সদগুণের সমাবেশে তৈরি হয়।

এবারে আমরা পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে সৌজন্যবোধে একটি কাহিনি জানব।

ভক্ত ধ্রুবর ছেলে উৎকল তখন পৃথিবীর রাজা। উৎকলও বাবার মতন ধর্মপ্রাণ। তাঁর দান ধ্যান যজ্ঞের সীমা ছিল না। প্রজাপালক রাজা হিসেবে তিনি সবার প্রিয় ছিলেন। প্রতিদিন অতিথি-অভ্যাগতদের দান করে, খাবার খাইয়ে তারপর তিনি নিজে খাবার গ্রহণ করতেন। তারপরে বসতেন রাজসভায়। তাঁর আচরণে কোনো বিরক্তি নেই। সদাই হাসিমুখ।

রাজার রাজসভা আলো করে থাকতেন অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, মরীচি, লোমশ, দুর্বাসা, বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি বড় বড় মুনি ।।রষঋি- এমন যে দানবীর রাজা, তাঁকেও একদিন মহাসংকটে পড়তে হলো। সেদিন যজ্ঞকর্ম শেষ করতে অনেক দেরি হয়েছে। শেষ বেলায় ক্লান্ত শরীরে রাজা এসে বসলেন সিংহাসনে। এমন সময়ে এক কঙ্কালসার দেহের ব্রাহ্মণ এলেন। তাঁর পরনে সামান্য কাপড়, একমাথা রুক্ষ চুলের জটা। তিনি এসে রাজাকে রীতি অনুযায়ী আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু ক্লান্ত রাজা ব্রাহ্মণকে যথাবিধি সমাদর করতে পারলেন না। তাঁর উচিত ছিল সিংহাসন থেকে উঠে এসে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানো, তাঁর সেবার উদ্যোগ নেওয়া। কিন্তু তিনি সেসবের কিছু না করে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানালেন মাত্র।

তাতে ব্রাহ্মণ গেলেন দারুণ রেগে! গর্জন করে বললেন, শিব আমার গুরু। শ্রীকৃষ্ণ আমার ঈশ্বর। তোমার সভায় আমি প্রার্থী হয়ে আসিনি। এসেছিলাম সাধুদর্শনে। কিন্তু তোমার এতই দম্ভ হয়েছে যে, আমার প্রতি যথাযথ সৌজন্য দেখাতে ভুলে গেলে! আমি অভিশাপ দিচ্ছি, রোগ-ব্যাধি তোমায় গ্রাস করবে, তুমি শ্রীহীন হবে। তোমার দম্ভ চূর্ণ হবে।

এই নিদারুণ কথা শুনে রাজা চমকে উঠলেন। সামান্য অবহেলায় কত বড় সর্বনাশ! সভার সমস্ত মুনিঋষিরাও চমকে উঠলেন। রাজার এত পূণ্যকর্ম কি একদিনের অশিষ্ট আচরণের কারণে বিফলে যাবে। তাঁরা সবাই মিলে ব্রাহ্মণের কাছে করুণা ভিক্ষা করলেন। এই অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের উপায় জানতে চাইলেন।

রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণকে সমাদর করে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সাধ্যমতো সেবা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে শাপমুক্তির উপায় জানিয়ে বিদায় নিলেন।

- পাঠ্যবইয়ে দেওয়া পরিস্থিতিতে কী ধরণের সৌজন্যবোধ প্রকাশ করা উচিত বলে শিক্ষার্থীর মনে হয় তা ভেবে প্রত্যেককে মৌখিকভাবে বলতে বলুন।
- তারপর দলে বা জোড়ায় আলোচনা করে পাঠ্যবইয়ের ৩.৬ ছকটি পূরণ করতে দিন।
- শিক্ষার্থীর করা তালিকার যেগুলো সে মেনে চলে সেগুলোতে গোল, যেগুলো মেনে চলো না সেগুলোতে তিনকোনা আর যেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করো সেগুলোতে চারকোনা চিহ্ন দিতে বলুন।

আমরা দেখলাম, আমাদের ধর্মগ্রন্থে অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনি আছে। সেগুলোর ভাবার্থ অনুসরণ করে আমরা নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হতে পারি। তেমনি আমাদের হিন্দুধর্মের ইতিহাসে অনেক মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা তাঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মানবিক মূল্যবোধ, জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের জীবন থেকেও আমরা নিজেকে সার্থক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা নিতে পারি।

এখানে আমরা এমন কয়েকজন আদর্শ মানব-মানবীর জীবন সম্পর্কে জানব যাঁদের অনুসরণ করে আমরাও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ মানুষ হতে পারি।

মৈত্রেয়ী

আনুমানিক তিন হাজার বছর আগে যাজ্ঞবল্ক্য নামের এক খ্যাতিমান ঋষি ছিলেন। একদিন সরযূ নদীতে স্নান করতে নেমে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হল, আর মাত্র কয়েকটি দিন বাঁচবেন তিনি। অথচ তখনও একটি বই লেখা বাকি। সম্পত্তিরও কোনো বিলিবণ্টন হয়নি। যাজ্ঞবল্ক্য চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরলেন।

তাঁর দুই স্ত্রী কাত্যায়নী আর মৈত্রেয়ী। তিনি স্ত্রীদের ডেকে বললেন— আমার মৃত্যু আসন্ন। এবার গৃহত্যাগ করে বাণপ্রস্থে যাবার সময়। যা-কিছু সম্পত্তি আছে তা তোমাদের দুজনকে ভাগ করে দিতে চাই। কাত্যায়নী বয়সে বড়। তাঁর কয়েকটি সন্তানও আছে। মৈত্রেয়ী তরুণী। তিনি আপন মনে থাকেন। তিনি সংসারধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যারও অনুশীলন করতেন। তাঁর জানার আগ্রহ ছিল অদম্য। তার মধ্যে একটা উদাস ভাব ছিল। কীসে তার আসক্তি বোঝা যায় না। যেন এমন কিছুর প্রত্যাশায় আছেন, কোনোদিন যার নাগাল পাওয়া যাবে না। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যর সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করে তিনি আনন্দ পেতেন। মৈত্রেয়ী কোনো সম্পত্তি নিতে রাজি হলেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে কিছুটা ভূমি নেওয়ার অনুরোধ জানালে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন, ভূমি পেলে কি আমি অমর হতে পারব?

যাজ্ঞবল্ক্য জবাব দিলেন, না। মৈত্রেয়ী বলল, তাহলে ভূমি নিয়ে আমি কী করব? যাজ্ঞবল্ক্য যতবারই কিছু দিতে চাইলেন ততবারই মৈত্রেয়ী তা প্রত্যাখ্যান করলেন। যা দিয়ে মানুষ অমর হয় না এমন কোনো কিছুরই তার প্রয়োজন নেই। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কেবল অমরত্বের সন্ধান চান।

মৈত্রেয়ী বলেন, শুধু আপনার আশ্রমের ধন-সম্পদ কেন, যদি ধন ধান্যে পরিপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী আমার হয়, তবে

কি আমি সেসব দিয়ে অমৃতত্ব লাভ করতে পারব? এই ধন-সম্পদ দিয়ে অনেক যাগ-যজ্ঞ করলেই কি আমি অমর হতে পারব?'

মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন শুনে যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উত্তর দিলেন, 'ধনী লোকের জীবন যেমন, তোমার জীবনও সেরকম হবে। বিত্ত দ্বারা কখনো অমৃতত্ব লাভ করা যায় না।' যাজ্ঞবল্ক্য আরও বললেন, 'মানুষ পার্থিব ভোগসুখের সঙ্গে মিশে গেলে তাঁর অমৃতের মধুর আস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। কারণ, মানুষ মরণশীল। সেই চির নিশ্চিত মৃত্যু এসে মানুষের সকল ভোগসুখের অবসান ঘটায়। তাই বিত্তদ্বারা কখনই অমৃতত্ব লাভের সম্ভাবনা নেই।'

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে মৈত্রেয়ী এই দার্শনিক সত্য উপলব্ধি করলেন যে, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নেই। মৃত্যু তাঁকে মুক্তি দেবে না। যদি অমৃতত্বের সন্ধান না পাওয়া যায় তাহলে ধন তুচ্ছ, বিত্ত তুচ্ছ, তুচ্ছ এই গৃহসংসার। মোহজালে পতিত মানুষের পরম সত্য লাভ হয় না।

মৈত্রেয়ী স্বামীকে বিমর্ষ বদনে বলেন, ''যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?'' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২/৪) অর্থাৎ যা দিয়ে আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব না, তা দিয়ে আমি কী করব? এই অসার ধন সম্পদ দিয়ে আমার কী হবে? আপনি যে ধন লাভ করে এই বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করেছেন, আপনি যে জ্ঞানে জ্ঞানী হয়েছেন, দয়া করে আমাকে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিন, আমাকে অমৃতত্ব লাভের সন্ধান দিন।'

মৈত্রেয়ীর কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত বাদ দিলেন। তিনি মৈত্রেয়ীর কাছে অমৃতত্বের ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'পতি যে পত্নীর প্রিয় হয়, তার কারণ পতিকে ভালোবেসে পত্নীর আত্মা সুখী হয়। পুত্র-কন্যাকে স্নেহ করে পিতা-মাতা আত্মিক সুখ অনুভব করেন, তাই সন্তানও পিতা-মাতার স্নেহে নিজ নিজ আত্মিক সুখ অনুভব করে। একারণে সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার প্রতি অনুরক্ত থাকে। মানুষ আসলে সম্পদকে ভালোবাসে না। সম্পদ মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে বলেই তা লোকের প্রিয় হয়। পতি বলো, পুত্র বলো, পত্নী বলো, দেবতাদের কথাও যদি বলো, সবাই নিজের আত্মার সুখের জন্যই অন্যের প্রিয় হয়ে ওঠে। আত্মাই মানুষের মুখ্য প্রীতির বস্তু। এছাড়া ধন, জন, বিত্ত, স্বর্গ— সব কিছুই গৌণ।'

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ শুনে মৈত্রেয়ী তৃপ্ত হলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন অমৃতের সাগর দূরে নয়। একেবারে নিজের অন্তরের ভেতরে। আত্মাই পরম অমৃত। অবশেষে মৈত্রেয়ী অমৃতের সন্ধান পেলেন।

- মৈত্রেয়ীর জীবন-দর্শন থেকে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা কীভাবে মানবকল্যাণে কাজে লাগাবে—দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে (ছক ৩.৭) লিখতে বলুন।

শ্রীচৈতন্য

পনেরো শতকের আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীচৈতন্য। অনুসারীদের মতে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার। শ্রীচৈতন্যর ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দুধর্ম সংস্কারে তাঁর ভূমিকা অনন্যসাধারণ।

শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে। তাঁর পিতার নাম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচীদেবী।

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর জীবনে অনেক কষ্টের অভিজ্ঞতা ছিল। একে একে তাঁদের আটজন কন্যা অকালে মৃত্যুবরণ করে। তারপর একটি পুত্র সন্তান হয়। তাঁর নাম বিশ্বরূপ। তিনি যৌবনেই ঘর ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদিন শচীদেবী ভগবানের চিন্তায় বিভোর হয়ে গঙ্গাস্নান করছিলেন। এমন সময় একটি তুলসীপাতা ভেসে এসে তাঁর নাভি স্পর্শ করে। এ ঘটনার কিছুদিন পর তাঁর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এই পুত্রের নাম রাখেন বিশ্বম্ভর। গৌর বর্ণের জন্য তাঁকে গৌর, গৌরচন্দ্র, গৌরাঙ্গও বলা হয়। তবে তাঁর ডাক নাম

নিমাই। পরবর্তীকালে এই নিমাই-ই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বা চৈতন্যদেব নামে খ্যাত হন।

নিমাইয়ের বয়স যখন দশ-এগারো, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মা শচীদেবী কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে খুব বিপদে পড়েন। বালক নিমাই ছিলেন খুবই চঞ্চল ও দুরন্ত। তবে তিনি যেমন দেখতে সুন্দর ছিলেন, তেমনি ছিলেন খুব মেধাবী । তাঁর মেধা এবং রূপের কারণে সকলেই তাঁকে স্নেহ করতেন। বিষ্ণু পন্ডিত নিমাইকে হাতেখড়ি দেন। নিমাই গঙ্গাদাস পন্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হন। বালক নিমাই পড়াশোনার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তাই অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, অলংকার, স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী। যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই লোকজনকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই তিনি পন্ডিত নিমাই হিসেবে সারাদেশে পরিচিতি লাভ করেন। এ সময় তিনি নিজেই একটি টোল খুলে ছাত্র পড়াতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মা শচীদেবী পন্ডিত বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষীদেবীর সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ে দেন। সেসময়ের প্রথা অনুযায়ী ছেলের বিয়েতে অনেক পণ নিতে পারতেন। কিন্তু শচীদেবী কোনো পণ নেননি।

সে সময় কেশব মিশ্র নামে কাশ্মীরে এক বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। তিনি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের পন্ডিতদের শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করে নবদ্বীপে আসেন। নবদ্বীপে এসে তিনি সেখানকার পন্ডিতদের শাস্ত্রবিচারে আহ্বান জানান। তিনি সগর্বে ঘোষণা করেন, ‘ হয় তর্ক বিচার করুন, না হয় জয়পত্র লিখে দিন।’ তাঁর পান্ডিত্যের কথা সবাই জানতেন। তাই তাঁর আহ্বানে নবদ্বীপের পন্ডিত-সমাজ ভীত হয়ে পড়েন। তখন তরুণ পন্ডিত নিমাই দিগ্বিজয়ী পন্ডিত কেশব মিশ্রের সম্মুখীন হন। গঙ্গাতীরে দুজনের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। নিমাইয়ের অনুরোধে কেশব মিশ্র তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে শতাধিক শ্লোকে গঙ্গাস্তোত্র রচনা করেন। আর নিমাই তখন শুরু করেন শ্লোকগুলোর সমালোচনা। তিনি কোন শ্লোকে কোথায় কী ভুল আছে তা ব্যাখ্যা করেন। নিমাইয়ের সমালোচনা শুনে উপস্থিত পন্ডিতগণ বিস্মিত হন। কেশব মিশ্রও তাঁর ভুল স্বীকার করেন। এ ঘটনার পর নবদ্বীপে নিমাইয়ের পান্ডিত্যের খ্যাতি আরো বেড়ে যায়।

কিছুদিন পর নিমাই একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসেন। নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে শুনলেন, স্ত্রী লক্ষীদেবী সর্পদংশনে মারা গেছেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর মধ্যে সংসার-বিমুখতা দেখা দেয়। তিনি অত্যন্ত ধর্মানুরাগী হয়ে ওঠেন। এ বিষয়টি বুঝতে পেরে মা শচীদেবী সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করতে সনাতন পন্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে নিমাইয়ের আবার বিয়ে দেন।

কয়েক বছর সুখেই কাটে। বাইশ বছর বয়সে যুবক চৈতন্য তাঁর মৃত পিতার আত্মার সদ্গতি কামনায় পিণ্ডদানের জন্য গয়ায় যান । সেখানে প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ও সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নিমাই একাকী সাক্ষাৎ করেন। তিনি ঈশ্বরপুরীর নিকট কৃষ্ণনামে দীক্ষা নেন। এতে তাঁর মনে বিরাট পরিবর্তন আসে। নবদ্বীপে ফিরে অধ্যাপনা, সংসারধর্ম সব ছেড়ে দেন। শুধু কৃষ্ণনাম করেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ। এঁরা তাঁর প্রধান পার্ষদ। তবে নিত্যানন্দ ছিলেন সবচেয়ে কাছের।

অনুসারীদের নিয়ে নিমাই বাড়ি-বাড়ি গিয়ে, এমনকি গ্রামের পথে পথে কৃষ্ণনাম প্রচার করতে থাকেন। এতে অবশ্য অনেকে ক্ষুব্ধ হন । অনেকে বাধাও দেন। জগাই-মাধাই নামে মাতাল দুই ভাই একদিন নিমাই ও নিত্যানন্দকে আক্রমণ করেন। কিন্তু নিমাই প্রেমভক্তি দিয়ে সবাইকে আপন করে নেন। তাঁরা সকলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিমাইয়ের এ প্রেমভক্তির ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।

এদিকে সংসারের প্রতি নিমাইয়ের মন একেবারেই উঠে যায়। তিনি সংসার ত্যাগ করার কথা ভাবেন। তারপর

মাঘমাসের শুক্লপক্ষের এক গভীর রাতে তিনি মা, স্ত্রী এবং ভক্তদের ছেড়ে গৃহত্যাগ করেন। কাটোয়ায় গিয়ে তিনি কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রেমভক্তির ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। পুরী, দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি স্থান ঘুরে তিনি জীবনের শেষ আঠারো বছর পুরীর নীলাচলে অতিবাহিত করেন। মাতৃভক্ত শ্রীচৈতন্য মায়ের অনুরোধে নীলাচলে থেকে জীবনের শেষ অবধি মায়ের খবরাখবর নেন। এ সময় শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট প্রমুখ বিশিষ্ট বৈষ্ণব পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেম দিন দিন আরও বাড়তে থাকে। পথে পথে তিনি 'কোথা কৃষ্ণ, দেখা দাও, দেখা দাও' বলে ঘুরে বেড়াতেন। শ্রীচৈতন্য প্রায়শই কৃষ্ণনামে উন্মাদ হয়ে থাকতেন। ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে একদিন তিনি দিব্যভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। হঠাৎ মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সবাই বাইরে উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন। তারপর দরজা খুলে তাঁকে আর দেখা যায় না। ভেতরে শুধু জগন্নাথদেবের মূর্তি। ভক্তদের ধারণা, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেবের দেহে লীন হয়ে গেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান নিয়ে বহু পণ্ডিতের বহু গবেষণা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনও কোনো সর্বসম্মত মীমাংসা হয়নি।

শ্রীচৈতন্য সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ মানেননি। তিনি সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা, সকল প্রকার ভেদাভেদ ও কুসংস্কার দূর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন। সমস্ত সংকীর্ণতার ওপরে উঠে যেভাবে শ্রীচৈতন্য অস্পৃশ্যতা বর্জনের আহ্বান জানিয়ে মানুষে মানুষে সমভাবের কথা বলেছিলেন। সেকালে তা ছিল রীতিমতো বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

তাঁর প্রেমভক্তির ধর্মে উচ্চ-নীচের কোনো স্থান ছিল না। তিনি সকলের প্রতি সমানভাবে স্নেহ ও ভালোবাসা বিতরণ করেছেন। তিনি সকলের সঙ্গে এক সারিতে বসে আহার গ্রহণ করেছেন। এভাবে তিনি হিন্দুসমাজকে নানা অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিভেদ, হানাহানিকে বহুলাংশে দূর করতে পেরেছিলেন।

শুধু হিন্দু নয়, তাঁর প্রেমভক্তির কাছে মুসলমান, খ্রিষ্টান ইত্যাদি জাতিভেদও ছিল না। সবাইকে তিনি প্রেম দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন:

১। যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছাড়।

কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।।

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।।

শ্রীচৈতন্যের অনুসারীদের প্রতিদিন কৃষ্ণবিষয়ক পাঠ করতে হতো। এই কারণে সেসময়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে নারী শিক্ষায় শ্রীচৈতন্য-প্রভাব লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকে বাংলার সম্ভ্রান্ত গৃহে মেয়েদের পড়ানোর জন্য বৈষ্ণবীরা আসতেন। বৈষ্ণবসমাজে নারীকে মর্যাদা দেওয়া হতো। এমনকি মেয়েরাও দীক্ষাদানের অধিকার পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও চৈতন্য প্রভাবই কাজ করেছে। চৈতন্যের প্রিয় ছিল কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণবিষয়ক পদকীর্তন। আবার বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য ছিল কৃষ্ণকথা পাঠ ও শ্রবণ। তার ফলে চৈতন্যদেবের সময়ে এবং তাঁর পরবর্তী বাংলার বৈষ্ণব পদাবলি হয়ে উঠেছিল আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্যে সম্পদবান।

- ধর্মকে কেন্দ্র করে শ্রীচৈতন্য সেকালের বাঙালি জীবনে যে নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন তা শিক্ষার্থীদের দলে/জোড়ায় খুঁজে বের করে ইনফোগ্রাফিক পোস্টারের মাধ্যমে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে বলুন।
- শ্রীচৈতন্যর জীবন থেকে পাওয়া যে শিক্ষাটি শিক্ষার্থী নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে চায় তা পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় (ছক ৩.৮) লিখে রাখতে বলুন। কাজটি বাড়িতেও করতে পারে।

বামাখ্যাপা

বামাখ্যাপা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সাধক। তিনি তান্ত্রিক মতে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সাধনার স্থল ছিল তারাপীঠ। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলা তারাপীঠের অবস্থান। এখানে আরও অনেক তন্ত্রসাধক সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। যেমন— আনন্দনাথ, কৈলাসপতি প্রমুখ। তারাপীঠ হিন্দুদের একটি বিশেষ তীর্থস্থান।

তারাপীঠের কাছে অটলা গ্রাম। ১৮৩৭ সালে শিবচতুর্দশী তিথিতে সেখানে বামাখ্যাপা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং মা রাজকুমারী দেবী।

বামাখ্যাপার আসল নাম বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। পরে তারামায়ের সাধনায় তাঁর খ্যাপামি বা একরোখা ভাব দেখে সবাই তাঁকে বামাক্ষেপা বলেই ডাকতেন। পিতা সর্বানন্দ খেত—খামারে কাজ করতেন। এতে যে সামান্য আয় হতো, তাতেই তাঁর সংসার কোনো রকমে চলে যেত।

সর্বানন্দ ছিলেন বড়ই ধর্মভীরু ও সরল প্রকৃতির মানুষ। অল্প বয়সে দীক্ষা নিয়ে তিনি তারামায়ের সাধনায় ডুবে যান। স্ত্রী রাজকুমারীও ছিলেন ধর্মপ্রাণা এবং ভক্তিমতী। এমন বাবা—মায়ের সন্তান হয়ে বামাচরণও তারামায়ের ভক্ত হন। 'জয় তারা জয় তারা'বলে তিনি মাটিতে লুটোপুটি খান। বামাচরণ সরলতা ও আপনভোলা ভাব অন্যের চোখে ছিল পাগলামি।

প্রথাগত লেখাপড়ার প্রতি বামাচরণের মন ছিল না। কোনোরকমে পাঠশালা শেষ করেন তিনি। উচ্চ বিদ্যালয়ে আর যাওয়া হয়নি।

বামাচরণ সুমিষ্ট স্বরে গান গাইতে পারতেন। একদিন তারামায়ের মন্দিরে গানের আসর বসেছে। বেহালা বাজাচ্ছেন পিতা সর্বানন্দ। সর্বানন্দ এক সময়ে বামাচরণকে কৃষ্ণ সাজিয়ে দিলেন। আর বামা নেচে—নেচে মিষ্টি কণ্ঠে গান গাইতে লাগলেন। গাঁয়ের মানুষ বামার কৃষ্ণরূপ দেখে আর গান শুনে পরম আনন্দ পেলেন।

একদিন বামাচরণ জেদ ধরেন শ্মশানে যাবেন। পিতা সর্বানন্দ কিছুতেই থামাতে পারেন না। অবশেষে বামাচরণকে নিয়ে তিনি শ্মশানপুরীতে গেলেন। মহাশ্মশান দেখে বামার মনে ভাবান্তরের সৃষ্টি হয়। তিনি শ্মশানভূমিকে ভালোবেসে ফেলেন।

এই ঘটনার পর বামা যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন। সত্যি সত্যি তিনি খ্যাপায় পরিণত হন। এ ক্ষেপামি তাঁর গভীর ধর্মনিষ্ঠার জন্য। শ্মশানভূমির সাথে, তারামায়ের সাথে তাঁর নিবিড় ভাব গড়ে উঠল। শুরু হলো বামাচরণের শ্মশানলীলা। সে সময়ে শ্মশানে ছিলেন তন্ত্রসাধক ও বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ। আরও ছিলেন ব্রজবাসী কৈলাসপতি। কৈলাসপতি বামাকে দীক্ষা দেন। আর মোক্ষদানন্দ দেন সাধনার শিক্ষা। শুরু হলো মহাশ্মশানে বামাচরণের তন্ত্রসাধনা।

এরপর হঠাৎ একদিন পিতা সর্বানন্দর মৃত্যু হয়। বামাচরণের বয়স তখন ১৮ বছর। সংসারের কথা ভেবে মা রাজকুমারী ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বামাকে কিছু একটা করতে বলেন। বামা একের পর এক কাজ নেন। কিন্তু

কোথাও মন বসাতে পারেন না। তাঁর কেবল তারামায়ের রাঙা চরণের কথা মনে পড়ে। একবার এক মন্দিরে ফুল তোলার কাজ নেন। কিন্তু রক্তজবা তুলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় তারামায়ের চরণযুগলের কথা। আর অমনি তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। কখনোবা ভাবে বিভোর হয়ে গান ধরেন। এক মনে গাছতলায় বসে থাকেন। ফলে তাঁর কোনো কাজই বেশিদিন টেকে না। এভাবেই তিনি বামাখ্যাপা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

বামাখ্যাপার এই ক্ষেপামি চলতেই থাকে। তারামায়ের সাধনায় তিনি মন—প্রাণ ঢেলে দেন এবং এক সময় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সিদ্ধিলাভের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন নাটোরের মহারানি অন্নদাসুন্দ-রী তাঁর কথা জানতে পারেন। তারাপীঠের রক্ষণাবেক্ষণের দায়েত্ব ছিল তখন নাটোরের রাজপরিবারের। রানির নির্দেশে বামাক্ষেপাকে তারাপীঠের পুরোহিত নিয়োগ করা হয়।

বামাখ্যাপা ছিলেন খুবই সহজ—সরল এক আত্মভোলা মানুষ। খাদ্য-অখাদ্য, পূজা—মন্ত্র কোনো কিছুই তিনি মানতেন না। ‘এই বেলপাতা লে মা, এই অন্ন লে মা, এই জল লে মা, এই ফুল ধূপ লে মা– এই ছিল বামার পূজা।

বামা তারামায়ের ভক্ত হলেও নিজের মাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। মা রাজকুমারী মারা যাওয়ার পর তাঁর দেহ তারাপীঠে আনা হয়। বামা তখন দ্বারকা নদীর ওপারে তারাপীঠ শ্মশানে। বর্ষকালে নদীতে প্রচন্ড ঢেউ। তাই ভয়ে কেউ মৃতদেহ ওপারে শ্মশানে নিতে চাইছে না। এপারেই দাহ করার আয়োজন করছে। কিন্তু মায়ের আত্মার সদ্গতির জন্য তারাপীঠের শ্মশানেই তাঁকে দাহ করা দরকার— এ কথা ভেবে বামাখ্যাপা মা-তারার নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। এপারে এসে মায়ের শরীর নিজের সঙ্গে বেঁধে সাঁতরে ওপারে গেলেন এবং শ্মশানে মায়ের দেহ দাহ করলেন।

বামাখ্যাপা লোকশিক্ষার জন্য বলতেন:

১। ধর্ম অন্তরের জিনিস। বেশি আড়ম্বর করলে নষ্ট হয়।

২। মায়াকে জয় করতে পারলেই মহামায়ার কৃপা পাওয়া যায়।

৩। তারা মায়ের করুণা পেলেও মোক্ষ লাভ হয়।

৪। গুরু, মন্ত্র আর ভগবান এঁদের মধ্যে পার্থক্য ভাবতে নেই। তোমরাও ভাববে না, তোমাদের মঙ্গল হবে।

৫। কলিযুগে মুক্তিসাধনা আর হরিনাম ছাড়া জীবের গতি নেই।

৬। দিনরাত যে কালীতারা, রাধাকৃষ্ণ নাম করে, পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

তন্ত্রসাধনায় অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে বামাখ্যাপা ১৯১১ সালে পরলোক গমন করেন।

- শিক্ষার্থীকে বলুন, বামাখ্যাপার জীবন থেকে পাওয়া যে বিষয়টি সে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে চায় সেটি ব্যাখ্যাসহ পাঠ্যবইয়ে (ছক ৩.৯) লিখে রাখতে।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন একজন নামকরা উকিল। ছিলেন সুপন্ডিতও। অনেক ভাষা জানতেন। বিবেকানন্দের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণা সুগৃহিণী।

বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ছেলেবেলায় তাঁর আর একটি নাম ছিল বীরেশ্বর। তবে আদর করে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সবাই তাঁকে ‘বিলে’ বলে ডাকতেন। বিলে ছিলেন খুব দুরন্ত ও একরোখা, ছিলেন একটু অন্য রকম। উদার দৃষ্টিভঙ্গি, জীবে দয়া— এসব ছিল তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। জাত-পাত ভেদ তাঁর ভালো লাগত না। তাঁর পিতার মক্কেলদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মুসলমান, খ্রিষ্টান সবই ছিল। বাড়ির বৈঠকখানায় তাঁদের সবার জন্য আলাদা আলাদ হুঁকা ছিল তামুক সেবনের জন্য। প্রত্যেক হুঁকার গায়ে নাম লেখা থাকত। নরেন্দ্রনাথ একদিন সব হুঁকায় মুখ লাগাচ্ছিলেন। এমন সময় পিতা বিশ্বনাথ এসে পড়েন। তিনি ছেলেকে বলেন, ‘এ কী হচ্ছে, নরেন?’ নরেন্দ্রনাথ বললেন, ‘আমি সব হুঁকা টেনে দেখলাম, কৈ আমার তো জাত গেল না!’ ছেলের এই অদ্ভুত কথা শুনে পিতা হেসে ফেললেন। প্রভাত যেমন সমস্ত দিনের ইঙ্গিত দেয়, এই ঘটনাও তেমনি সেদিন ভবিষ্যতের সর্বজীবে সমদর্শী বিবেকানন্দের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথ লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিলেন। পাশাপাশি খেলাধুলা ও গানবাজনায়ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন সত্যবাদী, তেমনি ছিলেন নির্ভীক। একদিন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পড়াচ্ছেন। বিলে তখন কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তা দেখে শিক্ষক রেগে যান। তিনি তাঁদের পড়া জিজ্ঞেস করেন। বিলে ছাড়া আর কেউ পড়া বলতে পারেননি। কারণ বিলে পড়াও শুনছিলেন আর কথাও বলছিলেন। তাই শিক্ষক বিলে বাদে অন্যদের দাঁড়াতে বললেন। তবে তাদের সঙ্গে বিলেও উঠে দাঁড়ালেন । শিক্ষক বললেন, ‘তোমাকে দাঁড়াতে হবে না।’ উত্তরে বিলে বললেন, ‘কেন, আমিও তো কথা বলেছি। অপরাধ তো আমিও করেছি।’ বিলের এই সততা ও সাহসিকতায় শিক্ষক খুব খুশি হলেন।

বিলে দরিদ্রদের খুব ভালোবাসতেন। তাই তাদের দেখলেই দৌড়ে ঘরে যেতেন। ঘরে জামা-কাপড়, খাবার-দাবার যা পেতেন এনে তাদের দিতেন। বিলে ছিলেন তাঁর খেলার সাথীদের দলনেতা। সুযোগ পেলেই তিনি সাথীদের নিয়ে ‘ধ্যান-ধ্যান’ খেলায় মেতে উঠতেন। কখনো একা-একাই ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। ধ্যান করাটা তাঁর একটা প্রিয় খেলা ছিল।

নরেন্দ্রনাথ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। আইন ও দর্শন বিষয়েও তিনি অনেক পড়াশোনা করেন। ১৮৮৪ সনে তিনি বিএ পাস করেন। এর পরপরই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ফলে তাঁদের পরিবার দারুণ অর্থসঙ্কটে পড়ে। মা এবং ছোট ভাই-বোনদের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় চাকরির সন্ধান করেন। কিন্তু সুবিধা হয় না। অবশেষে কলকাতার অ্যাটর্নি অফিসে একটা কাজ নেন। বই অনুবাদ করে কিছু-কিছু রোজগার করতে থাকেন।

এ সময়ে নরেন্দ্রনাথের মনে এক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন। ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এ ধররেন প্রশ্ন প্রায়ই তাঁর মনে জাগে। তিনি অনেককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করেছেন। কিন্তু কারো উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এমন সময় একদিন তাঁর দেখা হয় মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কলকাতার দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ একদিন চলে যান সেখানে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?’ শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন, ‘হ্যাঁ, দেখেছি; যেমন তোকে দেখছি। চাইলে তোকেও দেখাতে পারি।’

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগল। তাঁর প্রতি কেমন যেন একটা ভক্তির ভাব জেগে উঠল। তাই তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। নরেন্দ্রনাথ হন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজী বলেই ডাকতেন।

বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ এবং তার মানুষকে ত্যাগ করেননি। তাই তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথে পথে। নিজের চোখে দেখতে চাইলেন ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা। তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন। দেখলেন, সারা দেশে কেবল দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। কেবল অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুসংস্কার। দেশবাসীর

এই দুরবস্থা দেখে তিনি খুব ব্যথিত হলেন। তিনি এই অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর দারিদ্র্যের কারণ জানতে চাইলেন। কীভাবে এসব থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

দেশে তখন ইংরেজ শাসন চলছে। পরাধীন দেশ। তিনি বুঝতে পারলেন, পরের শাসনে দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাই দেশকে বাঁচাতে হবে। দেশকে জাগাতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। পরাধীন দেশ কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করতে হবে। সব মানুষকে ভালোবাসতে হবে। জীবনীশক্তির উৎস হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে দেবতাজ্ঞানে মানুষের সেবা। এই ধর্মমন্ত্রে সবাইকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সবার মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে। তবেই দেশের উন্নতি হবে।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান। ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা দেন। বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ‘হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক- ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।’ বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই অত্যন্ত মুগ্ধ হন। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠা বক্তা। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে আমেরিকার বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইট বলেছিলেন, ‘ইনি এমন একজন মানুষ, যাঁর পাণ্ডিত্য আমাদের সমস্ত অধ্যাপকদের মিলিত পাণ্ডিত্যকেও হার মানায়।’

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন, বিশেষত বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। তারপর যান ইউরোপ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়ান এবং বক্তৃতা দেন। তিনি বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্ব তুলে ধরেন। বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে, ‘জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই; জীবই ব্রহ্ম।’ তাই ব্রহ্মজ্ঞানে জীবসেবা করতে হবে। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেন যে, হিন্দুধর্ম কেবল মূর্তিপূজা করে না, সকল দেবতার পূজার মধ্য দিয়ে এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করে। তাঁর বক্তৃতা থেকে ইউরোপের মানুষ হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারেন। অনেকে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে এতটাই উদ্বুদ্ধ হন যে, নিজের জন্মভূমি আয়ারল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

প্রায় চার বছর পৃথিবী ভ্রমণ করে বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। দেশের মানুষ তাঁকে মহাসমাদরে গ্রহণ করে । বিশাল সংবর্ধণা দেয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি দেশের মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বলেন। সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে বলেন। সবাইকে বিভেদ ভুলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, ‘শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ।’ বিবেকানন্দ অথর্ববেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ‘অসত্য নয়, সত্যেরই জয়; একমাত্র সত্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর লাভের পথ প্রসারিত হয়।’

বিবেকানন্দ মানেননি ধর্মে ধর্মে বিভেদ, বিশ্বাস করেন নি জাতিভেদ প্রথা। বর্ণপ্রথা ও অস্পৃশ্যতাকে তিনি প্রবলভাবে ঘৃণা করতেন। তিনি ঘৃণা করতেন হিংসা, কূপমণ্ডূকতা, গোঁড়ামিকে। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি সকলকে অমৃতের সন্তান বলে মনে করতেন। তিনি সকল ধর্মের মানুষকে সমানভাবে ভালোবাসতেন। জীবন-যাপন পদ্ধতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পার্থক্য থাকলেও সকল ধর্ম, গোত্র ও বর্ণের মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। তিনি বলতেন- নীচ জাতি, মূর্খ , দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম।

বিবেকানন্দ দারিদ্র্য দূর করা এবং দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কথা ভাবতেন। তিনি বলতেন, খালি পেটে

ধর্ম হয় না। তাই সবার আগে মানুষের দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে। তিনি বলেছেন, ‘ অন্ন চাই! অন্ন চাই! দরিদ্রদের মুখে অন্ন জোগাতে হবে। আগে অন্ন, তারপর ধর্ম।’ তাঁর মতে, আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস এ দুটিই উন্নতি লাভের উপায়। যুবকদের আগে সুস্থ শরীর গঠন করতে হবে। তারপর ধর্ম চর্চা করবে। দুর্বল শরীরে ধর্মচর্চা হয় না। কোনো কাজই হয় না। এজন্য তাদের গীতা পড়ার আগে ফুটবল খেলতে হবে। তাতে সুস্থ শরীর গঠিত হবে। তখন তারা গীতা আরো ভালো বুঝবে।

বিবেকানন্দ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি বলতেন- দেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, সবাইকে সমানভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিতে হবে। তবেই একটি উন্নত জাতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। নিজে মানুষ হওয়া এবং অন্যকেও প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করা- এটিই হওয়া উচিত মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন প্রতিটি জীবের মধ্যেই ঈশ্বর অবস্থান করেন। সুতারং জীব সেবার চেয়ে বড় ধর্ম নেই। সে কারণে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন-

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥

তাঁর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে স্থাপিত হয়েছে শত-শত সেবাশ্রম, সেবাকেন্দ্র ও বিদ্যাশ্রম। এসবের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সেবা ও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখনো হচ্ছে।

বিবেকানন্দ জীবসেবার কথা শুধু মুখেই বলতেন না, স্বয়ং কাজ করেও দেখিয়েছেন। ১৮৯৮ সনে কলকাতায় একবার মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দেয়। তখন তিনি দার্জিলিংয়ে ছিলেন। প্লেগের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং গুরুভাইদের নিয়ে রোগীদের সেবায় কাজ করেন।

সমাজে নারীর দুর্দশা নিয়েও বিবেকানন্দর ভাবনা ছিল। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীর উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষালাভ করতে পারে, তাহলে এ যুগের নারীরা পারবে না কেন?’ তাঁর মতে যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে বিশ্বের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। তাই বিবেকানন্দ নারীদের উন্নয়নের ব্যাপারে খুবই সোচ্চার ছিলেন। তিনি বলেন, ‘মেয়েদের প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে। শিল্প-ব্যবসা-কৃষি শেখার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ মেয়েদের থাকতে হবে।’ তিনি নারীকে শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখতেন। তাই তিনি বলতেন- শক্তিকে বাদ দিয়ে বিশ্বের পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়। তাঁর মতে প্রত্যেক পুরুষের কাছে স্ত্রী ছাড়া অন্য সব নারীই মায়ের মতো হওয়া উচিত। বিবেকানন্দ সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিধবাবিবাহের প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগরকে মহাবীর বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়ে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকারও পরামর্শ দেন। বাল্যবিবাহকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি নারীদের সন্ন্যাস গ্রহণেরও পক্ষপাতি ছিলেন।

বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানবসেবার আর্দশ প্রচারের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ঞ মিশন স্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে এটি অবস্থিত। সাধারণভাবে এটি বেলুড় মঠ নামে পরিচিত। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনও প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে। পৃথিব্যাপী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে শত শত মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা, আপৎকালীন সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে সেবা প্রদান করতেন। একবার কলকাতায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

তখন রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। সেখানে কয়েকজন মুসলমান বালক এসেছিল থাকার জন্য। এদের কী করা হবে জানতে চাইলে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মুসলমান বালকেরা অবশ্যই থাকবে। শুধু তাই নয়, তাদের খাওয়া দাওয়া এবং ধর্মচর্চায় যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

বিবেকানন্দ কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। তাই বিশ্রামের অভাবে অল্প বয়সেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। ফলে ১৯০২ সালের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে তিনি দেহত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী:

১। ধর্ম এমন একটি ভাব যা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।

২। আমার ঈশ্বর কোনো দূর গ্রহ-উপগ্রহের অধিবাসী নয়, অজ্ঞতাবশত যাকে আমরা মানুষ বলি সেই আমার ঈশ্বর।

৩। পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাবশূন্য হলেই চলবে না, আমাদেরকে ঐ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গনও করতে হবে; সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি।

৪। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা - তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে সেই ঠিক ঠিক ধার্মিক।

৫। মানুষের মহত্ত্বের পরিচয় তার চরিত্রে, বৃত্তিতে নয়।

৬। অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বর ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ দর্শনই ধর্ম, ভেদ দর্শনই পাপ।

৭। ওঠো, জাগো, আর ঘুমিয়ো না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘোচাবার শক্তি তোমাদের নিজেদের ভেতরে রয়েছে- একথা বিশ্বাস করো, তাহলে শক্তি জেগে ওঠবে।

৮। যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পাড়া যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।

৯। হৃদয় ও মস্তিষ্ক দ্বারাই চিরকাল যা-কিছু বড় কাজ হয়েছে, টাকার দ্বারা নয়।

১০। ভেবো না তোমরা দরিদ্র, ভেবো না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখেছে- টাকায় মানুষ করেছে! মানুষই চিরকাল টাকা করে থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের শক্তিতে হয়েছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে।

১১। বিশ্বাসই হলো মানবসমাজ ও সব ধর্মের সবচেয়ে বড় শক্তি।

১২। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, কাতর- এরাই তোমার দেবতা হোক, এদের সেবাই পরম ধর্ম বলে জানবে। দরিদ্র দেবো ভব। মূর্খ দেবো ভব।

১৩। যার নিজের ওপর আস্থা তথা বিশ্বাস নেই তাঁর ঈশ্বরেও বিশ্বাস নেই।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, স্বামী বিবেকানন্দর একটি করে এমন বাণী, ভাবনা ও কাজ নির্দিষ্ট করতে যা তারা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে চায়। তারপরে পাঠ্যবইয়ের ৩.১০ ছকটি পূরণ করতে বলুন।
- স্বামী বিবেকানন্দর সময়ের যেসব সামাজিক সমস্যা আমাদের সময়েও আছে তার মধ্য থেকে তিনটি খুঁজে বের করে শিক্ষার্থীদের লিখতে (ছক ৩.১১) বলুন।
- এবারে দলে/ জোড়ায় প্রত্যেকের তালিকা থেকে বাছাই করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যাকে চিহ্নিত করতে বলুন। তারপরে খুঁজে দেখতে বলুন, স্বামী বিবেকানন্দ এই সংকট সমাধানের কী পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর দেখানো পথের আলোকে এই সময়ে প্রয়োগযোগ্য একটি সমাধান শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করতে বলুন।
- ইনফোগ্রাফিক পোস্টার, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি যে-কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে দলে/ জোড়ায় শিক্ষার্থীদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

গুরুচাঁদ ঠাকুর

গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া আদর্শের প্রচারক ও হিন্দু সমাজের একজন সংস্কারক হিসেবে সুপরিচিত। তিনি ১৮৪৭ সালের ১লা মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিচাঁদ ঠাকুর জাতপাত ও নারীপুরুষের মধ্যে সাম্যমূলক মতুয়া মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মাতার নাম শান্তিদেবী ঠাকুর।

গুরুচাঁদ ঠাকুর পাঠশালা পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন পদ্মবিলা গ্রামের দশরথ বিশ্বাসের কাছে। এরপর মল্লকান্দি গ্রামের গোলক কীর্তনীয়ার কাছে তিনি সংস্কৃত শেখেন। ফারসি ভাষা শেখেন আড়কান্দি গ্রামের মকুব মিয়ার মক্তবে। এরপর নিজ গৃহে নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যা সত্যভামা দেবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

খুব অল্প বয়সই তিনি পিতা হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া আর্দশ প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সাথে নানা ধরনের সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সাথেও যুক্ত হন। মতুয়া আদর্শের যেসব দিক তিনি বিশেষ ভাবে প্রচার করতেন, তা হলো- নারীপুরুষ নির্বিশেষে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত হওয়া, সংসার-জীবনের সাথে ধর্মাচার পালন করা, কোনো রকম জাতিভেদ না করা, ধর্মীয় পোষাক ও সাজসজ্জা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করা, কঠোরভাবে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া ইত্যাদি।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের সামাজিক সংস্কারের মূল লক্ষ্য অনগ্রসর হিন্দু সমাজের কল্যাণ। তাঁর প্রথম আন্দোলন নমঃশূদ্র নামক জাতির সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ১৮৭২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাঙালি কৃষিজীবী হিন্দুদের একটি বড় অংশকে সরকারী খাতায় চন্ডাল হিসেবে অভিহিত করে। গুরুচাঁদ ঠাকুর শাস্ত্রীয় তথ্যপ্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হন, এই পদবি সঠিক নয়। তাঁর নেতৃত্বে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। সরকারের কাছে লিখিত আবেদনও করা হয়। শেষে সরকারি খাতায় নমঃশূদ্রদের চন্ডাল পরিচয় বাদ দিয়ে নমঃশূদ্র লেখা হয়। নমঃশূদ্র জাতিরা তাদের আত্মমর্যাদা ফিরে পায়।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের দ্বিতীয় আন্দোলন গণশিক্ষা-বিষয়ক। মানুষকে সমভাবে শিক্ষাদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য এই আন্দোলন। কিন্তু সেসময়ে কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী ও শ্রমজীবী হিন্দুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল না। মনে করা হতো, এদের সন্তানেরা লেখাপড়া শিখলে সমাজে জীবিকার সংকট দেখা দেবে। গুরুচাঁদ ঠাকুর এর বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি মনে করেন, লেখাপড়া শেখা সকলের মৌলিক অধিকার। তাই গ্রামে গ্রামে

প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের কাছে তিনি ছুটে যান। তাদেরকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং লেখাপড়া শেখায় উদ্বুদ্ধ করেন। ১৮৮১ সালে বাগেরহাট জেলার দত্তডাঙ্গা গ্রামে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ও আসাম প্রদেশের থেকে প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিনিধি সেখানে যোগ দেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর সম্মেলনের সভপতিত্ব করেন। শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তিনি সেখানে তুলে ধরেন। ফলে মানুষের মাঝে একটি চেতনা সৃষ্টি হয়। লোকজন টাকা দিয়ে, জমি দিয়ে, শ্রম দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে এগিয়ে আসেন। এভাবে গুরুচাঁদ ঠাকুরের অনুপ্রেরণা ও উদ্যোগে সেসময়ে প্রায় ১৮২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরী হয়। যার অধিকাংশই ছিল পাঠশালা বা প্রাইমারি পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তিনি নিজে এর তদারকি করে গণশিক্ষার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের তৃতীয় আন্দোলন নারীসমাজের মুক্তির আন্দোলন। সেসময়ে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হতো। আবার, অল্প বয়সে কেউ বিধবা হলে দ্বিতীয় বার তার বিবাহের সুযোগও ছিল না। এটাই ছিল সামাজিক রীতি। বিধবা বিবাহের প্রাসঙ্গিক আইন বা বিদ্যাসাগর মহোদয়ের সামাজিক আন্দোলন সত্ত্বেও এই রীতি থেকে সমাজ বেরিয়ে আসতে পারেনি। বাল্যবিবাহও রোধ করাও সম্ভব হয়নি। গুরুচাঁদ ঠাকুর এব্যাপারে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। যার ফলে অনগ্রসর হিন্দুসমাজে ব্যাপকভাবে বিধবা বিবাহ চালু হয়। বাল্যবিবাহও রোধ হতে শুরু করে।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের চতুর্থ আন্দোলন সামাজিক অনুষ্ঠানে অপচয় রোধ করা। সেসময়ে পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ অথবা বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অনেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। নিজের শেষ সহায়-সম্বল পর্যন্ত অনেকে বিক্রি করে অর্থ জোড়াড় করতেন। এর উদ্দেশ্য নিজের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং সমাজের কর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া। এক্ষেত্রে গুরুচাঁদ ঠাকুর কঠোরভাবে নির্দেশ দেন- যার যতটুকু সামর্থ্য সেই অনুসারে ব্যয় করতে হবে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই নির্দেশানার পর শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অপচয় রোধ হয়।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের পঞ্চম আন্দোলন অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করা। সে-সময়ে অনগ্রসর কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্মানজনক সরকারি চাকরি প্রাপ্তির সুযোগ ছিল না। গুরুচাঁদ ঠাকুর এটাকে মনে করতেন মানবাধিকারের লঙ্ঘন। তাই তিনি এ নিয়ে জনমত গড়ে তোলেন। অনগ্রসরদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরি প্রাপ্তির বিষয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের কাছে জোর দাবি জানান হয়। ডক্টর সি এস মিড নামক একজন খ্রিষ্টান মিশনারি এ ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ সহযোগিতা করেন। ফলে অনগ্রসরদের জন্য যোগ্যতা অনুসারে সরকারি চাকরি প্রাপ্তির দরজা খুলে যায়।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের ষষ্ঠ আন্দোলন হিন্দুদের পেশাগ্রহণকে বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখা। সুনির্দিষ্ট পেশা সুনির্দিষ্ট জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে- গুরুচাঁদ ঠাকুর এই মতের সমর্থক ছিলেন না। যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুসারে মানুষ তার পেশাকে পরিবর্তন করেতে পারে- তিনি এই মতের সমর্থক। অর্থাৎ একজন কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী প্রয়োজনে ব্যবসায়ীও হতে পারে। অথবা ভিন্ন পেশার লোক প্রয়োজনে কৃষিকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এতে সামাজিক কোন প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত নয়। এব্যাপারে সমাজের মানুষকে তিনি বোঝাতে সক্ষম হন। কোন প্রতিবন্ধকতা আসলে সবাইকে সাথে নিয়ে তিনি তা সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্তও নেন। ফলে তাঁর এই আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের লোকজনদের মধ্যে পেশাপরিবর্তনে চেতনা সৃষ্টি হয়। শ্রমজীবী বা কৃষিজীবী মানুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়ে সফল হয়।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের সপ্তম আন্দোলন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান বিষয়ক আন্দোলন। অনগ্রসর শ্রেণির মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে আনতে তিনি সমবায় ভিত্তিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করেন। বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে ধর্মগোলা নামক একটি সংগঠন ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এর ফলে বছরের বিশেষ সময়ে অর্থসংকটে পড়া মানুষ উপকৃত হয়।

কবিগান ও ধুয়াগানকে (বাউল গানকে অনেক সময় এ নামে ডাকা হয়) গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর আদর্শ প্রচারের কাজে ব্যবহার করেন। সে সময়ের অসংখ্য লোককবিকে তিনি পৃষ্ঠপোষণ করেন। গুরুচাঁদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন

কবিয়াল ছিলেন তারকচন্দ্র সরকার। এছাড়া হরিবর সরকার, মনোহর সরকার, অশ্বিনী সরকার প্রমুখরা বড় বড় কবিয়াল। তখনকার হিন্দুসমাজে গুরুচাঁদের আদর্শকে গানের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে তাঁরা সক্ষম হন।

গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য ওড়াকান্দি গ্রামে একটি ছাপাখানা তৈরী করেন। নানা ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থ সেখান থেকে ছাপা হতো। ১৯০৭ সালে সেখানে নমঃশূদ্র সুহৃদ নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি অনগ্রসর হিন্দু সমাজের দুঃখকষ্টের কথা এবং তা দূর হওয়ার কঠিন সংগ্রামের কথা নিয়মিতভাবে করতে শুরু করে।

ওড়াকান্দিকে একটি তীর্থস্থানে পরিণত করার ব্যাপারেও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ব্যাপক অবদান রয়েছে। তিনি এখানে বড়ো আয়তনের একটি হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মতুয়াদের কেন্দ্রীয় হরিমন্দির হিসেবে ভক্তদের কাজে যা বিবেচিত। বেশ কয়েকটি দিঘিও এখানে খনন করা হয়। একটি দিঘির নাম দেওয়া হয় 'কামনা-সাগর'। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মতুয়া ভক্ত হরিচাঁদের জন্মতিথি উপলক্ষে ওড়াকান্দি ধামে আসেন। কামনা সাগরের জলে অবগাহন করে পুণ্য লাভ করেন- এই বিশ্বাস নিয়ে তার সেখানে অবগাহন করেন।

এই মহান ধর্মপ্রচারক ও সমাজসংস্কারক গুরুচাঁদ ঠাকুর ১৯৩৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেন।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের বিশেষ কয়েকটি বাণী:

১। খাও বা না খাও তাতে কোনো দুঃখ নাই।
ছেলেপিলে শিক্ষা দাও এই আমি চাই ।।

২। বিদ্যা ছাড়া কথা নাই বিদ্যা করো সার।
বিদ্যা ধর্ম, বিদ্যা কর্ম, অন্য সব ছার ।।

৩। নরাকারে ভূমণ্ডলে যত জন আছে।
এক জাতি বলে মান্য পাবে মোর কাছে ।।

৪। যথা ধর্ম তথা জয় এক বাক্য সার।
ধর্মপথে যে চলিবে ক্ষয় নাই তার ।।

৫। দুষ্ট বুদ্ধি করি ঠিক ওজন না দিলে।
বাণিজ্য হইবে ধ্বংস যাবে রসাতলে ।।

৬। পবিত্রতা সত্যবাক্য মানুষে বিশ্বাস।
তিন রত্ন যার আছে হরি তার বশ ।।

৭। পরদোষ ছেড়ে সদা নিজ দোষ কও।
আত্মগুণ ফেলে রেখে হরিগুণ গাও ।।

৮। হরিনামে ডঙ্কা মারো শঙ্কা করো কারে।
শ্রীহরি সহায় হয়ে সাথে সাথে ফেরে ।।

৯। যার দল নাই, তার বল নাই।

- শিক্ষার্থীকে বলুন, গুরুচাঁদ ঠাকুররে এমন একটি বাণী নির্ধারণ করতে যা অনুসরণ করে সে অপরের কল্যাণ করতে পারবে। কীভাবে করবে তা পাঠ্যবেইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় (৩.১৩) বুঝিয়ে লিখতে বলুন।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী

অখন্ড ভারতীয় উপমহাদেশের ইংরেজ শাসন কাল। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার অন্তর্গত বাণীগ্রাম। এ গ্রামে জন্ম নিয়েছেন স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী। পিতার নাম প্রতাপ মিত্র চৌধুরী এবং মাতার নাম শচী দেবী। তাদের কোল আলোকিত করে ১৯ শে মে ১৯০৩ সালে জন্ম নেয় এক শিশু। গুরুর নির্দেশ মতো বাবা এই শিশুর নাম রাখলেন অদ্বৈত।

গ্রামের স্কুলে অদ্বৈতর শিক্ষাজীবন শুরু। তিনি বাণীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অদ্বৈত ছিলেন বিনয়ী, পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল। শিক্ষকদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কোন কমতি ছিল না। ১৯২৩ সালে বাণীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অদ্বৈত সংস্কৃত ও গণিত বিষয়ে লেটার মার্কস নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। গ্রামের শিশু-কিশোরদের নিয়ে তিনি নাটকও মঞ্চস্থ করেন।

সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। সংস্কৃতে পান্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি পৈতৃক কবিরাজি পেশাতে তিনি যশ-খ্যাতির স্বাক্ষর রাখেন। মানুষের দৈহিক উন্নতির পাশাপাশি মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য তিনি বাড়িতে গড়ে তোলেন আর্যচতুষ্পাঠী।

তিনি বাড়ির শ্রীশ্রী রাজরাজেশ্বরী মন্দির অঙ্গনে তারকব্রহ্ম নাম যজ্ঞের প্রবর্তন করেন এবং শারদীয় উৎসবে তন্ত্রধারকের আসনে থেকেও পূজায় নিয়োজিত থাকতেন।

অদ্বৈত নিয়মিত যোগচর্চা তথা গভীর ধ্যানের জন্য রাতের অন্ধকারে নির্জন গহীন অরণ্যে চলে যেতেন। তিনি বলতেন, মনন করলে ত্রাণ পাওয়া যায়, তা-ই মন্ত্র। গভীর ধ্যানে ডুবে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ পাওয়া যায়। সাধনার বলে অদ্বৈত হয়ে ওঠেন শিবকল্পতরু শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী। লাভ করলেন অমৃতকুম্ভ তথা পূর্ণ জ্ঞান। তিনি বিবাহবন্ধনে আর আবদ্ধ হলেন না। তাঁর একান্ত অভিলাষ ছিল গৃহত্যাগ করে পরিব্রাজক সাধুরূপে নির্জন বনে চলে যাওয়ার। কিন্তু পিতা তাঁকে সংসারে থাকতে বাধ্য করেন এবং গুরু স্বামী জগদানন্দ তাঁকে ওই-সময় নিবৃত্ত করেন। কিন্তু তাঁর গুরুদেব জগদানন্দের সাথে তিনি সবসময় পরিব্রাজনের সঙ্গী হয়ে অনেক তীর্থ পরিক্রমা করেন। গুরুদেব তাঁকে বিদ্বৎ সন্ন্যাস প্রদান করেন। এই সন্ন্যাসের অর্থ হচ্ছে ফলত্যাগ করে মনেণাপ্রে- ।ারক ণহগ্র স্যান্নসতাঁর কাছে ধর্ম সত্য, ঈশ্বর পরম সত্য। তাঁর মতে, সত্য দিয়ে পরম সত্যে পৌঁছানোর জন্যই তৈরি হয়েছে এতরকমের মত, এতরকমের পথ। যারা সৎপথে গতিমান তাদেরকে তিনি আর্য বলে উল্লেখ করেছেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ বলতেন, কর্ম যার ধর্ম সেই তো সৎ। তার আচরণকে বলা হয় সদাচার। আমাদের দেহ মন বুদ্ধি ভোগ-মলিন। সদাচারে দেহ নিস্পাপ হয়, মন শান্ত হয়, বুদ্ধি মার্জিত হয়। দেশ ও দশের মঙ্গল কর্মকে তিনি ধর্ম বলতেন, বলতেন এরকম কর্মই যজ্ঞ।

পিতা প্রতাপচন্দ্রের দেহাবসানের পর ছোট ভাইয়ের ওপর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে, মনেণাপ্রে- জাব্ররপি রকে ণহগ্র স্যান্নসক হয়ে বেড়িয়ে পড়েন তীর্থভ্রমণে। তিনি আসামে দেবী কামখ্যাকে দর্শন করেন। হিমালয়ের মহাতীর্থ কেদারনাথ, বদ্রিনাথ, অমরনাথ, হরিদ্বার, হৃষিকেশে ভ্রমণ করেন। ভ্রমণ করেন কন্যাকু-মারী, রামেশ্বর সেতুবন্ধ, পন্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম, শৃঙ্গেরী মঠ এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গম।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা চিত্রকুটধাম ধাম দর্শন করেন। ভারতের সমস্ত তীর্থদর্শন শেষে বিদেহী গুরুর নির্দেশে তিনি জঙ্গল কোকদন্ডীর পরিত্যক্ত পাহাড়ি ভূমিতে ঋষিধাম প্রতিষ্ঠার কাজে মনোযোগ দেন। যা আজ অসংখ্য ভক্তের একটি সুন্দর আশ্রম। ১৯৫৪ সালে এদেশের ভক্তদের কথা ভেবে সনাতনী ঋষিদের আদর্শ সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে প্রবর্তন করলেন আকাশবৃত্তির মাধ্যমে ঋষিকুম্ভ ও কুম্ভমেলা। আকাশবৃত্তি মানে হলো ভগবানের অপার অনুগ্রহে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই মেলা প্রবর্তনের পর থেকে প্রতি তিন বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়।

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী ভারতের চারটি স্থানে কুম্ভমেলা হয়। এগুলো হলো হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী। তিন বছর পর চক্রাকারে চারটি স্থানে কুম্ভমেলা বসে। সে হিসাবে এককেটি স্থানে ১২ বছর পরপর এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র বাংলাদেশের ঋষিধামেই তিন বছর পরপর এই মেলার আয়োজন হয়। এতে দেশ-দবেি-

আ কলঞ্জিাম রম্ভকুেষিঋ রীরপু ন্দনাতদ্বঅৈ ীমাস্ব ।নরকে ণহ্গ্রশংঅ ারক্তভ ধ্াস কনতে রশয়োজন এবং তাঁর সামগ্রিক কর্মকান্ডে মুগ্ধ হয়ে চট্টগ্রামের নন্দনকাননস্থ তুলসী ধাম আখেড়ার মোহন্ত শ্রী জয়রাম দাস তাঁর সাথে দেখা করেন। পরে ১৯৬১ সালে ওই তুলসী ধামের মোহন্তের পূর্ণ দায়িত্ব স্বামী অদ্বৈতানন্দকে অর্পণ করেন।

চট্টগ্রামসহ দেশ ও দেশের বাইরে তাঁর লক্ষ লক্ষ শিষ্যবর্গ রয়েছে। তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে কাটিয়া বাবা,বিলোধ সাধু, মহিমানন্দ, রামপ্রসাদ, সদানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ পুরী সাধনানন্দ পুরী, সুধীর ব্রহ্মচারীরমােধীসলতু) বসেহে ীরাজপূ তয়ােবেসে ১৯৭১ সালে ঋষিধাম আশ্রমে মুক্তিযুদ্ধে পূজারত অবস্থায় শহীদ হন(, সচিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী, সুদর্শন ব্রহ্মচারী(জারাহম ন্তহামে রমােধেষিঋ নামর্তব), নিরঞ্জন ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণানন্দ পুরী,জগৎনাথ ব্রহ্মচারী, সুরেশ্বরানন্দ পুরী, চিন্তাহরণ পুরী,পূর্নানন্দ পুরী, নতুন চন্দ্র সিংহও ােতাষ্ঠতপ্রি রয়লোধষণ্ঠ ীরশ্বন্ডকে)(নহ দীহশ তাহে রদরোকাজার দ্ধযু ক্তমি নমোস রীরশ্বন্ডকে ীবদে ষ্টই জনিলাসে ১৭৯১, যোগেশ চন্দ্র সিংহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিষ্যবর্গের অনেকেই দেশরন্দনোতদ্বঅৈ ীমাস্ব শদেবে- ভাবাদর্শ প্রচারে মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করে মানবসেবায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ ১৬ই এপ্রিল ১৯৬৬ সালে ইহলীলা ত্যাগ করেন।

তাঁর প্রণীত দশমহাবিদ্যা, গীতায় গুরুশিষ্য, পার্থিব শিবলিঙ্গ রহস্য, শালগ্রাম তত্ত্ব, ধর্ম প্রবেশিকা, উপাসনা পদ্ধতি গ্রন্থসমূহ সাধন জগতের অমূল্য সম্পদ।

স্বামী অদ্বৈতানন্দর কিছু বাণী

১। কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার । কটুবাক্য প্রয়োগকারীকেও অন্যের কাছে ছোট হতে হয়। কর্কশভাষী মানুষ চিরদিনই অনাদরের পাত্র।

২। যাঁর কাজ উৎকৃষ্ট তিনিই গুরুস্থানীয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। তাঁকে সম্মান করতে হবে। সবার আগে আসন দিতে হবে।

৩। আত্মজ্ঞান লাভের সাধনায় আমাদের সাধনা, আর্য ঋষিদের পদাঙ্ক অনুসারী আমরা । নিজে মুক্ত হয়ে অন্যকে যুক্ত করাই আমাদের কাজ। বহুত্বের মাঝে একত্ব ভাবনাই আমাদের মোক্ষম ভাবনা। আমরা সকলের, সকলকে সাথে নিয়েই চলব । কোন দল উপদল সৃষ্টি করতে আমরা আসিনি। বহুজনের সুখ বিধান ও বহুজনের হিত কামনা আমাদের ব্রত।

৪। আমরা দোষদর্শী। পরের গুণ না দেখে কেবল দোষ খুঁজে বেড়াই। দোষচর্চায় হৃদয় কলুষিত হয়।

৫। যাকে দান করা হবে তার মধ্যে আছেন নারায়ণ। দান করবে শ্রদ্ধার সঙ্গে। সামর্থ্য অনুসারে। দান করবে সন্তর্পণে। যাবতীয় ধন ঈশ্বরের অতএব দান করবে বিনম্রভাবে। দান করে যেন অহংকার না আসে।

৬। কর্মযোগীর নিষ্ঠা কর্মে, জ্ঞানযোগীর নিষ্ঠা জ্ঞানে। দুটো পথ অভিন্ন। অনাসক্তির পথ। এই পথই রাজপথ।

- শিক্ষার্থীকে বলুন, স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরীর জীবন থেকে পাওয়া যে শিক্ষাটি তার কাছে অনুসরণীয় বলে মনে হয় তা লিখতে (ছক ৩.১৪)।

শ্রীমা

ফ্রান্সের প্যারিস শহর। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি। তুরস্কের মোসেস মরিস আলফাসা এবং মিশরীয় মাথিল্ডে ইসমালুনের এক কন্যা সন্তান জন্মাল। শিশুটির নাম রাখা হয় ব্লাঞ্চে রাচেল মীরা আলফাসা। বড় হয়ে ভারতের পুদুচেরি, পূর্বের পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে আসার পর তাঁর নাম হয় শ্রীমা।

শৈশবকাল থেকেই শ্রীমার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জেগে ওঠে। তাঁর বয়স যখন মাত্র চার বছর, তখনই তিনি মাঝে মাঝে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তেন। আর পাঁচজন শিশুর মতো শৈশবেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। শুধু পড়াশোনা নয়, পার্থিব কোনো কিছুর প্রতিই শ্রীমার কোনো আসক্তি ছিল না। সারাক্ষণ তিনি ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর থাকতেন। আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকতেন।

প্যারিস শহরের বাইরে ছিল এক প্রকাণ্ড বন। শ্রীমা সময় পেলেই সেখানে গিয়ে গাছতলায় ধ্যানে বসতেন। তাঁর উপর দিয়ে নির্ভয়ে পাখি উড়ে যেত, তাঁর শরীরে বসত, খরগোশ লাফাত, কাঠবিড়ালীরা ছোটাছুটি করত। এমনিভাবে প্রকৃতি, গাছপালা ও পশু-পাখির সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ সম্পর্কিত বই পড়ে তাঁর মনে ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং ধর্ম জানার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। এরপর তিনি ফরাসি ভাষায় ভাগবত গীতা ও অন্যান্য হিন্দুধর্মীয় বই পড়েন। এতে তার মনে পরিবর্তন আসে। তিনি আলজেরিয়ার ক্লেমসেন শহরে যান। সেখানে তেঁও নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে হঠযোগ ও গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন।

দেশে ফিরে শ্রীমা আরো গভীরভাবে ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন হন। তিনি উপলব্ধি করেন ঈশ্বর জ্যোতির্ময় এবং তাঁর সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক আছে। একবার তিনি স্বপ্নে এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখতে পান। তিনি শ্রীমাকে বলেন, ‘ওঠো, আরও উপরে ওঠো। সকলকে ছাড়িয়ে উপরে ওঠো, কিন্তু সকলের মাঝে ব্যাপ্ত করে দাও নিজের আত্মাকে।’

শ্রীমা এবার ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব পড়তে শুরু করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থান ভারতবর্ষে আসার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বামী পল রিশারকে নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন ।

ভারতবর্ষে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা ২৯ মার্চ পুদুচেরির অরবিন্দ আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে ঋষি অরবিন্দকে দেখে শ্রীমার স্বপ্নে দেখা সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের কথা মনে পড়ে। তাঁর মনে হলো, তিনি যেন বিধিনির্দিষ্ট এক বিশেষ দিব্যকর্ম করার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন। মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তিনি উপলব্ধি করেন, অরবিন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মধ্যেই আছে তাঁর আত্মার মুক্তি। সারা পৃথিবীর মধ্যে পুদুচেরির আশ্রমকেই তাঁর কাছে স্বর্গ মনে হলো। এই শান্ত তপোবনের মধ্যে তিনি খুঁজে পান তাঁর সকল সাধানার সিদ্ধি, তাঁর আত্মার চূড়ান্ত সার্থকতা। তাই তাঁরা দুজনেই আশ্রমে থেকে যান। শ্রীঅরবিন্দের নিকট দীক্ষা নেন। তাঁর সাধনকর্মের সহযোগী হয়ে ওঠেন। তখন আশ্রম থেকে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় ‘আর্য’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তাঁরা দুজনেই এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে অরবিন্দকে সাহায্য করতে লাগলেন।

কিন্তু এ যাত্রায় শ্রীমা বেশিদিন ভারতে থাকতে পারেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই তাঁদের প্যারিসে ফিরে যেতে হলো। এতে শ্রীমা ব্যকুল হয়ে ওঠেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর কাছে পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিচ্ছেদের মতো মনে হতে লাগল।

এভাবে কেটে গেল প্রায় পাঁচ বছর। ইতোমধ্যে যুদ্ধ থেমে গেছে। অরবিন্দের কাছ থেকে তিনি ভারতবর্ষে আসার আহ্বান পান । তাঁর মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। আর বিলম্ব নয়। তিনি ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তিনি পুদুচেরিতে ফিরে আসেন। তাঁর মন শান্ত হয়। গুরুদেবের নির্দেশমতো তিনি নিয়মিত যোগ সাধনা শুরু করেন। ইউরোপীয় বেশভূষা ত্যাগ করে ভারতীয় যোগিনীর বেশ ধারণ করেন। তাঁর পরনে তখন দেশি শাড়ি। খাদ্যদ্রব্যও দেশীয়। আমিষের পরিবর্তে নিরামিষ। পরে অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে মা ইউরোপীয় পোশাকও পরতেন। কারণ অরবিন্দ বলতেন, ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করতে পারলে বাইরের পোশাক-পরিচ্ছেদে কিছু যায়-আসে না।

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেন। সেদিন থেকেই একটি ঘরে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন। ফলে আশ্রমের সমস্ত দায়িত্বভার পড়ে শ্রীমার ওপর। শ্রীমাও সর্বান্তঃকরণে সে ভার গ্রহণ

করেন। তিনি পৈতৃক সূত্রে অনেক সম্পদ ও অর্থ পেয়েছিলেন। তা দিয়ে তিনি আশ্রমের খরচ চালান। দিনদিন আশ্রমে লোকজন বাড়তে থাকে। শ্রীমাও অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে সকলের ভরণ-পোষণ করেন। কর্মফলের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে তিনি পরের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে লাগলেন। খাদ্য, কৃষি, শিল্প, গো-পালন প্রভৃতি বিভাগ খুলে শ্রীমা আশ্রমটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলেন।

শ্রীমা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হলে শরীরকে সুস্থ রাখতে হয়। এজন্য যোগব্যায়াম প্রয়োজন। তাই তিনি আশ্রমে একটি ব্যায়ামাগার গড়ে তোলেন। আশ্রমবাসীদের চিকিৎসার জন্য তিনি একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। এ হাসপাতালে সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া শুরু হয়।

শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীমা আশ্রমে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তার নাম হয় 'ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অফ এডুকেশন'। এখানে আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। বিশ্বের সব দেশের শিক্ষার্থী এখানে পড়াশোনা করতে পারে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঋষি অরবিন্দ বিদ্যালয়ের শাখা আছে। এর মূল কেন্দ্র পণ্ডিচেরিতে।

আশ্রমের একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো এখানে কোনো ভেদাভেদ নেই। আশ্রমে যাঁরা থাকেন তাঁদের সকলকেই কাজ করতে হয়। ছোট-বড় কাজে কোনো পার্থক্য নেই। ধর্মীয় গোঁড়ামি বলতে কিছু নেই। আশ্রমের সকলকে শ্রীমা সন্তানের ন্যায় ভালোবাসতেন। মায়ের মতোই তিনি সকলের সুখ-দুঃখের খবর রাখতেন। শুধু তাই নয়, আশ্রমের গাছপালা ও পশু-পাখির প্রতিও মায়ের ছিল গভীর ভালোবাসা। আশ্রমে নতুন অতিথি এলে তিনি সকলকে বুঝিয়ে দিতেন, কেউ যেন এদের প্রতি অসম্মান না করে। কেউ যেন গাছের পাতা বা ফুল না ছেঁড়েন বা অকারণে গাছের ডাল না ভাঙেন।

মা সবসময় কাজ নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। দিনরাত শুধু কাজ আর কাজ। কাজই যেন ছিল তাঁর জীবন। আজীবন তিনি সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করে মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন।

মা শুধু একজন জ্ঞানতপস্বিনী বা যোগিনীই ছিলেন না। তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড সৌন্দর্যবোধও ছিল। এক নিবিড় সৌন্দর্যবোধের দ্বারা তিনি বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য সাধন করে চলতেন। তিনি চাইতেন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি বাইরের প্রকৃতির মতো সুন্দর হয়ে উঠুক। এভাবে তিনি আশ্রমটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমিরূপে গড়ে তুলেছিলেন।

শ্রীমার এক অভাবনীয় পরিকল্পনা ছিল শ্রীঅরবিন্দের নামে অরোভিল নগর প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৫ সালে শ্রীমা বিবৃতি দেন যে,"অরোভিল একটি সর্বজনীন শহর হতে চায় যেখানে বর্ণ, রাজনীতি ও জাতীয়তা নির্বিশেষে সকল দেশের নারী ও পুরুষ শান্তি ও প্রগতির সাথে বাস করতে সক্ষম হবে।" পরের বছর ভারত সরকার কর্তৃক অরোভিলের ধারণাটি ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় উত্থাপন করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত হয়। এর দু'বছর পর প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ শহরটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য জড়ো হন। পৃথিবীর ১২৪টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা আসেন। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের কিছু মাটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সবার জন্মভূমির মাটি একটি শ্বেত মার্বেলে তৈরি পদ্ম আকৃতির পাত্রে রাখা হয়। এটি বর্তমানে অরোভিলের অ্যাম্ফিথিয়েটারে সংরক্ষিত আছে।

১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মায়ের জন্মদিনে অরোভিল নগরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০০৬ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে ৪৯টি দেশের প্রায় আড়াই হাজার মানুষ অরোভিলে বাস করে। শ্রীমার আদর্শকে শিরোধার্য করে সেখানকার অধিবাসীরা সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করছে।

শ্রীমা টেনিস খেলা থেকে শ্যুটিং— নানান দক্ষতা আয়ত্ব করেছিলেন। সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন । গানও জানতেন। ভালো অর্গান বাজাতে পারতেন। প্রতি বছরের শেষ দিন রাত বারোটার পর তিনি অর্গান বাজিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতেন। বিভিন্ন রচনায় তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা ও কবিত্বশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে পণ্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রম এক আদর্শ স্থান হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অরবিন্দ আশ্রম গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও অরবিন্দ আশ্রম রয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শ্রীমা ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি দিয়ে বাংলাদেশের পাশে থাকতে বলেছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর পণ্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রমে এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

- শ্রীমার জীবনী থেকে পাওয়া তথ্য ও শিক্ষার আলোকে পাঠ্যবইয়ের ছকটি পূরণ করে শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন জার্নাল (ছক ৩.১৫) লিখতে বলুন।

ধাপ ৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের ২/৩ জনের দল গঠন করে এলাকার নিকটতম মন্দির বা আশ্রম থাকলে মন্দির কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে পরিদর্শন করতে বলুন।
- এলাকার মন্দির পরিদর্শন করে কী কী মানবকল্যাণমূলক কাজ দেখতে পেয়েছে এবং আর কী কী করা যায় তা প্রতিফলন জার্নালে (ছক ৩.১৬) লিখে রাখবে।
- সবার প্রতিফলন জার্নাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, মন্দিরের মাধ্যমে আর কী কী মানবকল্যাণমূলক কাজ করা যায়, দলে/ জোড়ায় তার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ণ করতে বলুন। পরিকল্পনায় তথ্য ছবি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনুষঙ্গ যুক্ত করতে বলুন।
- আপনার উদ্যোগে পরিকল্পনাটি মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ৭: সহমর্মিতা

যোগ্যতা ৯.৩

হিন্দুধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।

অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ

বিষয়বস্তু

সহমর্মিতা

এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে-

- সহমর্মিতার ধারণা লাভ
- চিন্তায়, কাজে ও আচরণে সকলের প্রতি সহমর্মিতার প্রকাশ করা
- মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা

ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, সমাজ, দেশ, পৃথিবীতে যেসব সমস্যা রয়েছে তার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীরা এককভাবে দশটি সমস্যার তালিকা করবে। দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে সবার তালিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ দশটি সমস্যা বেছে নিয়ে একটি করে সম্ভাব্য প্রতিকার লিখে উপস্থাপন করবে। সকলের উপস্থাপনা থেকে পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশটি সমস্যা এবং সমাধান শিক্ষার্থী এককভাবে লিখে রাখবে।

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের কাজ, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহমর্মিতা সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা অন্যের বিপদে-আপদে পাশে থাকার জন্য জন্য একটি 'একাত্মতা কর্নার' তৈরি করবে। সেখানে যেসব জিনিস রাখতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি করে প্রত্যেকে একটু একটু করে জিনিস সংগ্রহ করবে। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা এরকম কোনো সংকটে ত্রাণ হিসেবে বিতরণ করবে।

বিশেষ নির্দেশনা:

শ্রেণিভিত্তিক এ যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভি-জ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ৬ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

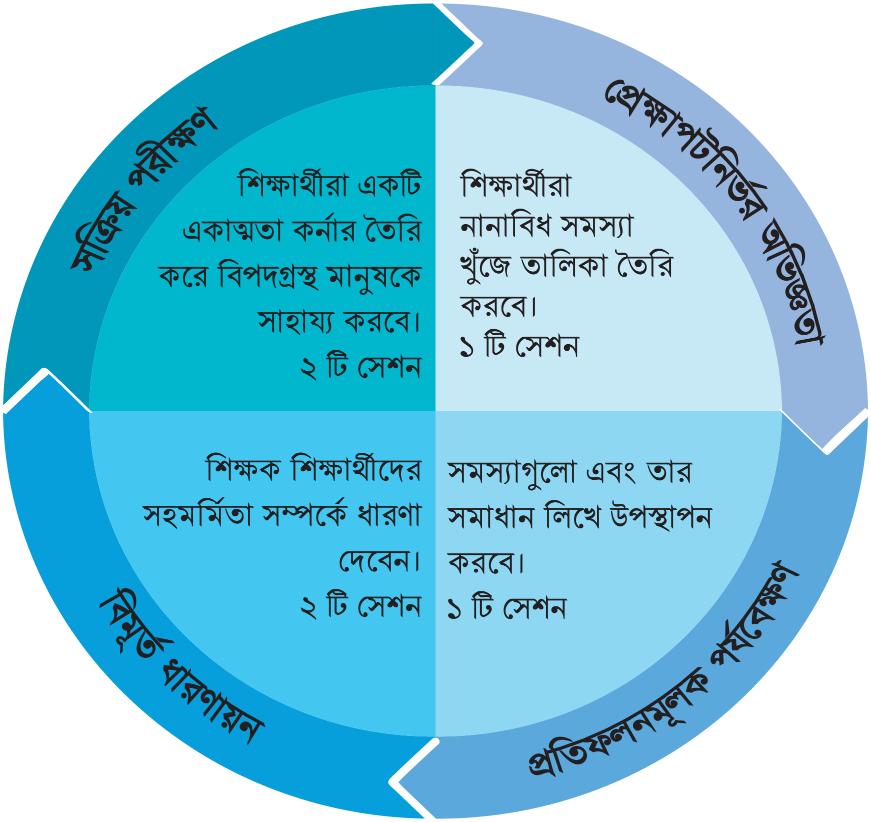

ধাপ ১ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, সমাজ, দেশ, পৃথিবীতে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ করুন।
- এবারে তাদের প্রত্যেককে পাঠ্যবইয়ে (ছক ৩.১৭) এরকম দশটি সমস্যার তালিকা করতে বলুন।

ধাপ ২ : প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ১ টি

- শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে সবার তালিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ দশটি সমস্যা বেছে নিতে বলুন।
- এবারে দলে/ জোড়ায় আলোচনা করে সমস্যাগুলোর একটি করে সম্ভাব্য প্রতিকার লিখে পোস্টার তৈরি করে উপস্থাপন করতে বলুন।
- তারপর সকলের উপস্থাপনা থেকে পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি সমস্যা ও তার সমাধান পাঠ্যবইয়ের ৩.১৮ ছকে এককভাবে লিখতে বলুন। কাজটি বাড়িতেও করতে দিতে পারেন।

ধাপ ৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ২ টি

- শিক্ষার্থীদের বলুন, এই যে আমরা সমস্যাগুলো সনাক্ত করলাম অর্থাৎ মানুষ ও প্রকৃতরি দুর্দশার উৎস অনুধাবন করলাম এবং কীভাবে তার প্রতিকার করা যায় তাও খুঁজে দেখলাম— এই কাজগুলো আসলে অন্যের প্রতি আমাদের সহমর্মিতার প্রকাশ। প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহমর্মিতা সম্পর্কে ধারণা দিন।

সহায়ক তথ্য

সহমর্মিতা

এই যে আমরা সমস্যাগুলো সনাক্ত করলাম অর্থাৎ মানুষ ও প্রকৃতরি দুর্দশার উৎস অনুধাবন করলাম এবং কীভাবে তার প্রতিকার করা যায় তাও খুঁজে দেখলাম— এই কাজগুলো আসলে অন্যের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা প্রকাশ করা। আমাদের অন্তরের এই সহমর্মিতাবোধ কোনো নির্দিষ্ট প্রাণী, ব্যক্তি, লিঙ্গ, শ্রেণি, সম্প্রদায়, অঞ্চল ইত্যাদির বিবেচনা করে আসে না। প্রকৃত সহমর্মী মানুষ স্থান কাল পাত্র ভেদ না করে, সকলের জন্যই সহমর্মিতা অনুভব করেন। অন্যের সুবিধা-অসুবিধাকে নিজের সুবিধা-অসুবিধার চেয়ে বড় করে দেখেন।

সকল জাতি ও ধর্মের মানুষ, সকল শিশু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সকলেই সমান। কেউ বড় কেউ ছোট নয়। হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে সকল জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। জীবের সেবা মানে তাঁরই সেবা। ঋগবেদে (৫.৬০.৫) আছে, মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে কেউই বড় নয়, কেউই ছোট নয়। সবাই সমান। প্রভুর আশীর্বাদ সবারই জন্য। সুতরাং সকলের প্রতি সহমর্মী হওয়া ধর্মের অঙ্গ। এটি মানুষের নৈতিক গুণ। তাই সবসময়ে, সকলের জন্য নিজের অন্তরে সহমর্মিতার বোধ লালন করা এবং বাক্য ও আচরণে তার প্রকাশ করা প্রয়োজন। সামবেদে বলা হয়েছে, সত্যিকারের ধার্মিক সবসময়ে মিষ্টভাষী ও অন্যের প্রতি সহমর্মী (সামবেদ ২.৫১) ।

মানুষ, গাছপালা, প্রাণী, প্রকৃতির সকল জড়বস্তু— ঈশ্বর সবকিছুকে একসূত্রে গেঁথেছেন। তাই সব মানুষ এবং সমস্ত প্রকৃতির প্রতি আমাদের সহমর্মী হতে হবে।

হিন্দুধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ, মনীষীদের বাণীতে আমরা সহমর্মিতা সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা পাই। চলো, আমরা তার মধ্য থেকে কয়েকটি পড়ি।

ওঁ সহনাববতু, সহনৌভুনক্তু, সহ বীর্যংকরবাবহৈ।
তেজস্বীনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ।।
ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।। —— তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।১

অর্থাৎ, পরমাত্মা আমাদের উভয়কে (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী) সমানভাবে রক্ষা করুন এবং সমান জ্ঞানদান করুন; আমরা যেন সমানভাবে বিদ্যালাভের সামর্থ্য অর্জন করতে পারি; আমাদের উভয়েই অর্জিতবিদ্যা তেজস্বী রণরেধ নতি ইএ —হোক; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ।কাহ৫ শানবি রিঘ্নবেি

সমাজকে ভালোবাসো। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। দুর্গতকে সাহায্য করো। সত্য ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন করো। [ঋগবেদ ১.১২৫.৬]

হে মানবজাতি, তোমরা সম্মিলিতভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হও। পারস্পারিক মমতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে একত্রে পরিশ্রম করো। জীবনের আনন্দে সম অংশীদার হও। [অথর্ববেদ ৩.৩০.৭]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “যুদ্ধ নয়, সহমর্মিতা; ধ্বংস নয়,সৃষ্টি; সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতি। বলেছেন, বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি। তিনি অন্যের সুখ-দুঃখকে অনুভব করে নিজের আচরণ নির্ধারণ করতে বরেছেন। তাঁর কথায়, জীবনে কাউকে আঘাত করার আগে ভেবে নেবে নিজে আঘাত পেলে কেমন লাগে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন,
মনের কথা প্রাণের ব্যাথা
বলিস কেবল তাকে পেলে
উপেক্ষা তোমায় করে না যে জন
যায় না তোমায় ঠেলে ফেলে।

- শিক্ষার্থী নিজের জীবনে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে এরকম একটি ঘটনার কথা ৩.১৯ ছকে কমিক আকারে লিখতে বলুন।

সহমর্মিতা সম্পর্কে মহাভারতের একটি কাহিনি শোনো।

মহাভারতের রাজা পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে ছিল। তাঁরা হলেন- যুধিষ্ঠীর, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। তাঁদেরকে একত্রে পঞ্চপাণ্ডব বলা হতো। বনবাসের সময় তাঁরা বনের ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতেন। একদিন অর্জুন বন থেকে কিছু ফল আহরণ করলেন। তাঁদের মাতা কুন্তি দেবী এ ফলগুলো ছেলেদের সমানভাবে ভাগ করে খেতে বললেন, কিন্তু ভীম ঐ ফলগুলো খেতে রাজি হলেন না, কারণ ফল ছিলো খুবই অল্প। সবাই জানত ভীমের বিশাল শরীরের জন্য বেশী পরিমান খাবার লাগত। অল্প খাবারে তার ক্ষুধা নিবৃত হতো না। বাকি চার ভাই মনে মনে বিষয়টা বুঝতে পারলেন - ভীমের খাবার কম হয়েছে বিধায় সে খেতে চাচ্ছে না। প্রথমে যুধিষ্ঠীর, পরে অন্য ভাইয়েরা তাঁদের ভাগ থেকে কিছু কিছু ফল ভীমকে দিলেন, ভীম এতে মহাখুশি হয়ে আনন্দে ভোজন করতে লাগলেন। বাকী চার ভাইও আনন্দে খেতে শুরু করলেন। তা দেখে কুন্তি দেবীর চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল, তিনি সবাইকে বললেন, এই সহমর্মিতার ভাব যেন তাঁরা আজীবন ধরে রাখতে পারে। তখন যুধিষ্ঠীর মাকে বললেন, মা আমরা পাঁচ ভাই একে অপরের পরিপূরক।

সহমর্মিতা নিয়ে মহাভারতের আরও একটি কাহিনি—

মহাভারতের আরেক চরিত্র রাজা পরীক্ষিত। তিনি অর্জুনপুত্র অভিমন্যু বিরাট রাজ্যের রাজকন্যা উত্তরার পুত্র। যুধিষ্ঠিরের পর পরিক্ষীত হস্তিাপুরের রাজা হয়েছিলেন। পরিক্ষীত ছিলেন খুবই ধার্মিক এবং প্রজাবৎসল রাজা। একবার তিনি শিকারে যান। সেখানে একটি হরিণকে তাড়া করে কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না। হরিণকে তাড়া করতে করতে তিনি এক মাঠের পাশে এলেন। সেখানে তিনি মহর্ষি শমীককে দেখতে পেলেন। রাজা পরীক্ষিত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি একটি হরিণকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছেন? কিন্তু মহর্ষি তখন মৌনব্রত নিয়েছেন। তাই তিনি কোনো কথা বললেন না। রাজা তাঁর কাছে আবারও জানতে চাইলেন। এবারেও কোনো

জবাব দিলেন না। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত এবং বিরক্ত পরীক্ষিত বারবার একই প্রশ্ন করেও শমীকের কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে ভীষণ রেগে গেলেন। কাছেই পড়ে ছিল একটা মরা সাপ। রাজা সাপটাকে তুলে মহর্ষির গলায় পেঁচিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

রাজা পরীক্ষিত মহর্ষি শমীককে চিনতেন না। কিন্তু মহর্ষি ঠিকই রাজাকে চিনতেন। তিনি রাজার ধর্মনিষ্ঠতা এবং প্রজাবাৎসল্যর কথা জানতেন। তাই এই ঘটনায় শমীক একটুও রাগ করলেন না। কিন্তু শমীকের ছেলে শৃঙ্গী মুণি ছিলেন ভীষণ রাগী। তিনি এই ঘটনার কথা জানতে পেরে চরম অভিশাপ দিলেন। বললেন, যে আমার বাবাকে এমন অপমান করেছে সে সাতদিনের মাথায় তক্ষক নামের সাপের কামড়ে মারা যাবে।

মহর্ষি শমীক এই কথা জেনে খুব দুঃখ পেলেন। ছেলেকে বললেন, তুমি খুব বড় ভুল করেছ। আমরা তপস্বী। ক্ষমাই আমাদের ধর্ম। পরীক্ষিতের কাছে অপমানিত হয়েও মহর্ষি শমীক রাজা পরীক্ষিতের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি রাজাকে এই অভিশাপের ফল থেকে বাঁচানোর জন্য রাজাকে সব ঘটনা জানানোর ব্যবস্থা করলেন।

ধাপ ৪ : সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ২ টি

আপনি নিচের তথ্যগুলো ভালোভাবে পড়বেন। শিক্ষার্থী অন্যান্য ধর্মের সহমর্মিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তথ্যগুলো জানাবেন।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, অন্যের বিপদে-আপদে তাদের পাশে থাকার জন্য জন্য একটি ‘একাত্মতা কর্নার’ তৈরি করতে।
- সহপাঠী শিক্ষক অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ করে একাত্মতা কর্নারে কী কী জিনিস রাখতে পারে, সকলে মিলে তার একটি তালিকা তৈরি করে এককভাবে পাঠ্যবইয়ে (ছক ৩.২০) লিখে রাখতে বলুন। তালিকা তৈরির জন্য তারা বোর্ড ব্যবহার করতে পারে। সকলের মতামত নিয়ে বোর্ডে তালিকাটি সম্পন্ন করে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় টুকে রাখতে পারে।
- তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেককে একটু একটু করে জিনিস সংগ্রহ করতে বলুন। সম্ভব হলে আপনিও সামান্য জিনিস দিয়ে অংশ নিন।
- সমস্ত জিনিস একত্র করে স্কুলের একটি সুবিধাজনক জায়গায় জড়ো করে রাখতে বলুন। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা এরকম কোনো সংকটে ত্রাণ হিসেবে বিতরণ করতে বলুন।

ইসলামে সহমর্মিতা

ইসলাম মানবিক মূল্যবোধ চর্চা করতে শেখায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন তারই অংশ। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সমাজের সবার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। মহানবি (সা.) এবং সাহাবিদের জীবনে সহমর্মিতার অনেক বাস্তব শিক্ষা দেখতে পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে এমন সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, ‘যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেনি তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।’ (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৮)

মহানবি মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্বজগতের জন্য কল্যাণকামী ও সহানুভতিশীল। তিনি সকল ধর্মের অনুসারীদের প্রতি সহ-মর্মিতা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাকে বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণকামী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। (সুরা আল আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭) মহানবি (সা.)-এর জীবনআদর্শে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি সহমর্মিতার অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতেন। তাঁর পবিত্র সাহচর্যে রোগী স্বস্তি বোধ করতো। এমনকি অমু-

সলিম কেউ অসুস্থ হলেও তিনি তাকে দেখতে যেতেন। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। বিভিন্নভাবে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। একবার এক ইহুদি বালক অসুস্থ হয়ে পড়লে মহানবি (সা.) তাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

একবার হযরত আসমা বিনত আবু বকরের মা আসমার কাছে বেড়াতে আসলেন। তিনি সাথে করে মেয়ের জন্য কিছু উপহার এনেছিলেন। কিন্তু তিনি অমুসলিম ছিলেন বলে আসমা (রা.) সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার মা তো অমুসলিম। মায়ের সাথে আমি কেমন আচরণ করবো?' রাসুলুল্লাহ (সা.) আসমা (রা) কে নির্দেশনা দিলেন, তিনি যেন তার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করেন।

মক্কার কুরাইশরা সবসময় মহানবি (সা.) কে হত্যা করতে চেয়েছে, ইসলামকেও নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু মহানবি (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেন। ইতোপূর্বে বদর যুদ্ধের সময় যেসব ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছিল, তাদের সাথেও তিনি সহমর্মী হতে ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের পরে বনু হানিফা গোত্রের প্রধান হযরত সুমামা ইবন উসাল (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যখন মক্কায় গেলেন, মক্কার কুরাইশরা বলল, 'সুমামা, তুমি তো ধর্মত্যাগী হয়েছো'। সুমামা তখন বললেন, 'আমি মুসলমান হয়েছি'। যতক্ষণ না রাসুলুল্লাহ (সা.) আদেশ দেন, তোমাদের এক দানা গমও আমি পাঠাবো না।' এরপর সুমামা ফিরে এসে গম রফতানি বন্ধ করে দেন। কুরাইশরা চরম খাদ্যাভাবে পড়ে গেলো। তখন তারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে খাবারের জন্য অনুরোধ করলো। রাসুলুল্লাহ (সা.) অনতিবিলম্বে সুমামাকে গম সরবরাহ করার আদেশ করলেন। সুমামা পুনরায় গম সরবরাহ শুরু করেন। মক্কাবাসীর খাদ্যের অভাব দূর হল। অথচ মক্কার কুরায়শরা তখনও রাসুলুল্লাহ (সা.) কে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ইতোপূর্বে তারাই মহানবি (সা.) কে তিন বছর খাদ্য-পানীয় না দিয়ে শিয়াবে আবু তালিব উপত্যাকায় আটকে রেখেছিলো। মহানবি (সা.) চাইলে তাঁর শত্রুদেরকে খাদ্যের কষ্ট দিয়ে দূর্বল করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু এই ভয়াবহ নির্দয় শত্রুর প্রতিও তিনি অসাধারণ সহমর্মিতা দেখালেন।

সাহাবিরা সবসময় অন্যকে নিজের ওপরে প্রাধান্য দিতেন। নিজেরা অভাবগ্রস্থ হলেও অন্যকে উজাড় করে দিতে কার্পণ্য করতেন না। নিজেরা ক্ষুধার্ত হলেও অন্যের মুখে খাবার তুলে দিতেন। নিজেদের ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ি, কৃষিজমি, গবাদি পশু- সবকিছুই তারা অপরের কল্যাণে অবলীলায় দান করতেন।

ইসলামে সহমর্মিতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সহমর্মী ব্যক্তিকে আল্লাহ দুনিয়া-আখিরাত সর্বত্র সাহায্য করেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব কষ্টের একটি দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর অভাবের কষ্ট লাঘব করে, মহান আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের কষ্ট লাঘব করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ বান্দার সহায়তায় থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহায়তায় থাকে।' (মুসলিম) ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সাথে সহমর্মিতার সরাসরি সংযোগ রয়েছে। যেমন হাদিসে রমজান মাসকে সহমর্মিতার মাস বলা হয়েছে। দান-সদকা করা, যাকাত দেয়া, খাদ্য প্রদান করা, ইয়াতিম ও বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা- প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম আখিরাতে মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) -এর সন্তান। তাই সবাই একই পরিবারভুক্ত এবং পরস্পরের ভাই। তাই ভাই হিসেবে একে অপরকে সহযোগিতা করা, তার বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা, তার প্রতি সহমর্মী হওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য।

বৌদ্ধধর্মে সহমর্মিতা

বুদ্ধ মানুষের দুঃখমুক্তির জন্য তাঁর শিক্ষা আজীবন প্রচার করে গেছেন। বুদ্ধ বলেছেন, মানুষ মাত্রই দুঃখ ভোগ করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ও মানসিক অশান্তি, হতাশা, অস্থিরতা ইত্যাদি দুঃখ থেকে মুক্ত

নয়। বুদ্ধ দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায়ও বলে দিয়েছেন। সংসারের যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে তিনি শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দিয়েছেন।

বুদ্ধের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো কায়িক সংযম, বাক সংযম ও মনো সংযমের মাধ্যমে ভালো, সুখী ও প্রজ্ঞাবান মানুষ হওয়া। এর জন্য ব্যক্তিগত জীবনে পাঁচটি নীতি অনুসরণ করা উচিত। যথা, হত্যা, চুরি, মিথ্যা বলা, নারী-পুরুষের মধ্যে অসদাচার ও মাদকাসক্তি হতে বিরত থাকা। এগুলোকে একত্রে পঞ্চশীল বলে। পঞ্চশীল অনুসরণ করে যে কোনো ব্যক্তি যেমন নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, তেমনি পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। পঞ্চশীল পালনের উপকারিতা সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, "অভযং দেতি, অবেরং দেতি, অব্যাপজ্জং দেতি"। অর্থাৎ পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে সমাজের মানুষ ভয়, হিংসা এবং মানসিক ও শারিরীক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকে। যেমন, হত্যা ও মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকলে সমাজে সহিংসতা থাকে না; অন্যের জিনিস চুরি না করলে সমাজের মানুষের সম্পত্তির সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়; ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকলে পারিবারিক মূল্যবোধ ও শান্তি সুদৃঢ় হয়। সমাজের মানুষ মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকলে সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ভালো হয়, তাদের মধ্যে আস্থা, সুসম্পর্ক ও সহমর্মিতা তৈরি হয়। এতে সামগ্রিকভাবে সামাজিক পরিবেশ উন্নত হয়।

বুদ্ধ বলেছেন, সমাজের মানুষের বড় শত্রু হলো লোভ, দ্বেষ ও মোহ (অজ্ঞতা)। এ তিনটি শত্রু থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বুদ্ধ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা নীতি অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা – এ চারটি নীতিকে একত্রে ব্রহ্মবিহার বলে। এ ব্রহ্মবিহার নীতি চর্চা করে যে কোনো ব্যক্তি অপরিমেয় পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারে, যার ফলে তিনি মহত্তম ও দেবতুল্য হন। ব্রহ্মবিহারী মানুষের মধ্যে সব সময় সকল জীবের প্রতি দয়া থাকে; তিনি বিপদগ্রস্তদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সব সময় সচেষ্ট থাকেন; তিনি অন্যের সুখে সুখী হন। তিনি জাগতিক লাভ-অলাভ, নিন্দা-প্রশংসা, সাফল্য-ব্যর্থতা ও সুখ-দুঃখের মধ্যেও মানসিকভাবে বিচলিত হন না।

ব্রহ্মবিহারের প্রথম নীতি 'মৈত্রী'র মূল অর্থ হলো সবার জন্য কল্যাণ ও সুখ কামনা করা। মৈত্রীর মাধ্যমে অসীম প্রেম, সহমর্মিতা, সহভাগিতা, বন্ধুতা তৈরি হয়। মৈত্রী হলো নিঃস্বার্থ ও সর্বজনীন ভালোবাসা। মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণির প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করতে বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছেন। এ মৈত্রী শুধু মানুষের প্রতি নয়, সকল জীবের প্রতি পোষণ করতে হবে। সে কারণে বুদ্ধ বলেছেন, 'সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু' – জগতে সকল সত্তা সুখী হোক। এ মৈত্রী ভাবনা সব সময় করতে হবে।

দ্বেষের প্রতিষেধক হলো করুণা। করুণার অর্থ হলো মানুষ ও সব সত্তার প্রতি নিঃস্বার্থভাবে দয়া পোষণ করা, তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিরসনের জন্য চিন্তা করা এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত করবার জন্য সাহায্য করা। যেমন, কোনো অসহায় রোগীকে দেখে তার প্রতি সমব্যথা ও দয়া অনুভব করে কেউ যদি ওষুধ ও ভালো পথ্য খাইয়ে তাকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করেন, তাহলে সেটাই হলো করুণা। যার মনের মধ্যে করুণা উৎপন্ন হয়, তিনি কারোর ক্ষতি করতে পারেন না; অন্যের আপদে বিপদে সহায়তায় এগিয়ে আসেন।

মুদিতা অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে বিদ্বেষভাব দূরীভূত হয়। মনের ভেতর থেকে ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করে অন্যের সুখ ও সাফল্যে সুখ অনুভব করাই হলো মুদিতা। যেমন, কোনো শিক্ষার্থী যদি খুব পরিশ্রম করে ভালো ফল অর্জন করে এবং পুরস্কার লাভ করে, তার সাফল্যে খুশি হওয়া। সে ভবিষ্যতে যাতে আরো উন্নতি করতে পারে তাকে উৎসাহ দেওয়া ও সহযোগিতা করা। এককথায়, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার বিপরীত অবস্থাই হলো মুদিতা। মুদিতার মাধ্যমে অন্যের সাফল্যে আনন্দ উদযাপন করা যায়, কারোর মনে হিংসা থাকে না এবং মনের ভেতর থেকে বিদ্বেষভাব দূর হয়।

উপেক্ষা নীতি অনুশীলনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। তখন তার মনে লোভ, দ্বেষ বা কোন কলুষতা থাকে না। প্রজ্ঞাবান মানুষ যেমন নিজে দুঃখমুক্তি লাভ করেন, তেমনি অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে দুঃখমুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারেন।

ব্যক্তিজীবনে পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে এবং সমাজে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো ব্যক্তি জীবনের আধ্যাত্মিকতা অর্জনের ভিত্তি, তেমনি সমাজের মানুষের মাধ্যমে পারস্পরিক সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠারও ভিত্তি।

বুদ্ধ মানবিক গুণাবলী অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নিজের স্বার্থসিদ্ধি নয়, বরং অন্যের সেবা করে তাদের দুঃখ লাঘব করাই হলো মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য। এ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষকে অনেক মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে হয়। মানবিক গুণাবলি অর্জন তথা মানবিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার দু'টো জিনিস খুবই জরুরী। সেগুলো হলো হিরি (নৈতিক লজ্জা) ও অত্তপা (নৈতিক ভয়)। হিরি অর্থ হলো যে কোনো খারাপ কাজ করতে মনে মনে লজ্জা বোধ করা; আর অত্তপা অর্থ হলো খারাপ কাজ করলে দুঃখ ভোগ করতে হবে, সে ভয়ে খারাপ কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। যার মনের মধ্যে নৈতিক লজ্জা (হিরি) ও নৈতিক ভয় (অত্তপা) থাকে সে কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না। মাদকাসক্তি, নেশা, লোভ-লালসা, ক্রোধ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, ঘৃণা ইত্যাদি কোনো খারাপ কাজে জড়িত হতে পারে না। তার মধ্যে অন্যের প্রতি মৈত্রী, করুণা, সহমর্মিতা গড়ে ওঠে, সে কখনো অন্যের কোন ক্ষতি করতে পারে না। সে সব সময় অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। পরস্পরের মধ্যে সদ্বাব, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা বজায় থাকে। এতে সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা হয়।

খ্রীষ্টধর্মে সহমর্মিতা

পবিত্র বাইবেল থেকে সহমর্মিতা বিষয়ক শিক্ষা-

লেবীয় ২৫:৩৫, ১ পিতর ৩:৮ ও মথি ২৫:৩৫-৪০।

অসহায় ও অসমর্থদের প্রতি সহমর্মিতা: “যদি তোমাদের দেশবাসীর মধ্যে কেউ দরিদ্র ও তোমাদের মাঝে কেউ নিজের ভরণ-পোষণ চালাতে অসমর্থ হয়, তাহলে তাকে সাহায্য করো, যেমন তোমরা বিদেশী এবং অপরিচিতদের প্রতি করে থাকো; যেন তোমাদের মাঝে সে বসবাস করতে পারে।” - লেবীয় ২৫:৩৫ পদ।

একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা: “সবশেষে বলি, তোমরা সবাই পরস্পরের সঙ্গে মিল রেখে বসবাস করো; তোমরা সহানুভূতিশীল, একে অপরকে ভালোবাসো, দরদি ও নতনম্র হও।” - ১ পিতর ৩:৮।

গরীব দুঃখীদের প্রতি সহমর্মিতা: “যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দিয়েছিলে; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে; আর যখন আমি জেলখানায় বন্দি অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে...আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।” - (মথি ২৫:৩৫-৩৬, ৪০)।

ব্যাখ্যা

পবিত্র বাইবেলে অসহায়, অসমর্থ, গরীব, দুঃখী সকল মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা স্রষ্টার সেবা করতে পারি। আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হওয়া। আমরা মানুষসহ সকল সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হবো।

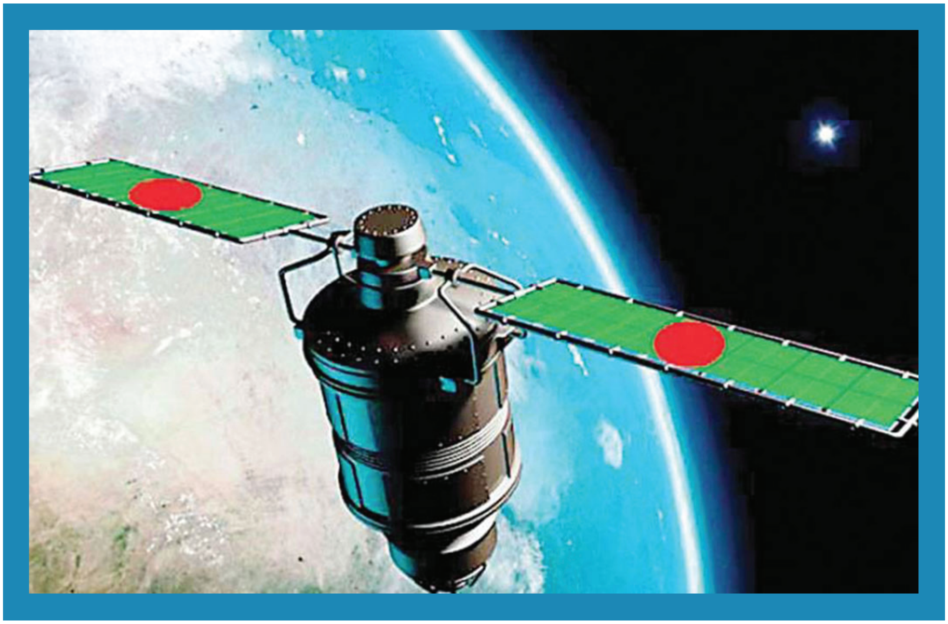

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ : বাংলাদেশের মালিকানাধীন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির (Geostationary) যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ। এর মধ্য দিয়ে ৫৭ তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। এটি ১১ই মে ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ছিল ফ্যালকন ৯ ব্লক-৫ রকেটের প্রথম পেলোড উৎক্ষেপণ।

এটি ফ্রান্সের থেলিস অ্যালেনিয়া স্পেস কর্তৃক নকশা ও তৈরি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, ১৬০০ মেগাহার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪০টি কে-ইউ এবং সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার বহন করছে এবং এর আয়ু ১৫ বছর। এর নির্মাণ ব্যয় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইথ ও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ইন্টারনেট বঞ্চিত অঞ্চল যেমন- পার্বত্য ও হাওড় এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট ও ব্যাংকিং সেবা, টেলিমেডিসিন ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রসারেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলো তাদের সম্প্রচার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে এর উপর নির্ভর করছে। ফলে দেশের টাকা দেশেই থাকছে। বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়লে এর মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় যোগাযোগ চালু রাখা সম্ভব। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ মহাকাশে উৎক্ষেপণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন, সেই স্বপ্ন মহীরুহে পরিণত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

স্যাটেলাইটের বাইরের অংশে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার রঙের নকশার উপর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু-১, বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোগ্রামও সেখানে রয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
নবম শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
হিন্দুধর্ম শিক্ষা

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ

–শ্রী রামকৃষ্ণ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য